রাজনীতির মুখোশে দুর্নীতি

মোহাম্মদ সিফাত

রাজনীতির মুখোশে দুর্নীতি

ISBN: 9798298417587
Imprint: Independently published

লেখক: মোহাম্মদ সিফাত

pag.saiz.5-8in

উৎসর্গ
এই গ্রন্থ উৎসর্গ করছি আমার প্রিয় পাঠক এবং সকল দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের প্রতি, যারা সত্য ও
ন্যায়ের পথে এগিয়ে যেতে
সংকল্পবদ্ধ।

ভূমিকা

বাংলাদেশের ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাঙালি জাতি নতুন স্বপ্ন ও প্রত্যাশায় এগিয়ে আসে। তবে সেই স্বাধীনতা কখনোই শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনেনি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতীয় চেতনার রূপকথা, যা তাদের অধিকার ও মর্যাদার লড়াই হিসেবে ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এই জাতির সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের প্রতীক হলেও স্বাধীনতার পরের দিনগুলো ছিল আরও কঠিন। শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশে বেড়েছে গুম, খুন ও রাজনৈতিক নিপীড়ন। বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক নেতা, মানবাধিকার কর্মী ও সাধারণ মানুষের ওপর নির্মম অত্যাচার, রাজনৈতিক বন্দিত্ব এবং দমন-পীড়ন সাধারণ হয়ে উঠেছে। দুর্নীতি ও লুটপাটের মাপকাঠি আজ অতীতের থেকে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি প্রকল্প থেকে শুরু করে প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে দুর্নীতির থাবা ছড়িয়েছে, যা দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা দিনের পর দিন বাড়ছে; ভোট ডাকাতি, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, দলীয় বিরোধ, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ও জনমতের প্রতি উদাসীনতা দেশের গণতন্ত্রকে শূন্য করে তুলেছে। জনগণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, বিচার ব্যবস্থায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বেড়েছে, ফলে সাধারণ মানুষ ন্যায় পেতে অসমর্থ। এমন পরিস্থিতিতে দেশের শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব দেশের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী গণআন্দোলন ছিল দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবিচারের প্রতিবাদ। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, শিক্ষার সংকট, স্বাস্থ্য সেবার দুর্বলতা ও রাজনৈতিক অবিচারের বিরুদ্ধে জনগণ রাস্তায় নেমে গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের দাবি তুলেছিল। তবে সরকারের নির্মম দমন-পীড়ন

সূচী পত্র

অধ্যায় ১ : জন্ম ও সংগ্রাম

১। ব্রিটিশ শাসন, বাংলার বিভাজন ও স্বাধীনতা ৪

২। স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃতি : একচোখা বর্ণনার রাজনৈতিক খেলা ৯-১০

৩। মওলানা ভাসানীর আদর্শ ও সংগ্রাম ১০-১২

অধ্যায় ২ : স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ, রাজনীতি, দুর্নীতি ও জনগণের অধিকার

৪। স্বাধীনতা নয়, ক্ষমতার খেলা : শেখ মুজিব ও আওয়ামী নেতৃত্বের নগ্ন বাস্তবতা ১২-১৪

৫। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী ভারতের লুট, শোষণ ও সীমান্ত নিপীড়ন ১৪-২০

৬। স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি ২২-২৩

৭। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ব্যর্থতা ২৩-২৪

৮। ভোট ডাকাতদের হাতে বন্দি বাংলাদেশ ২৫-২৬

৯। স্বৈরাচারের বীজ : শেখ মুজিবের একদলীয় শাসন ও করুণ পরিণতি ২৬-২৮

১০। জাতির পিতা একজনই – তাহলে মুজিব কীভাবে পিতা? ২৮-৩০

১১। রক্তের রঙ পাল্টায়, শাসনের রূপ নয় : শেখ থেকে হাসিনা ৩০-৩১

১২। শেখ হাসিনার আমলে আলেমদের জুলুম, গুম ও নির্যাতন ৩২-৩৪

১৩। দলীয় রাজনীতি ও প্রতিহিংসার সংস্কৃতি ৩৪-৩৫

১৪। দুর্নীতি : রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তরে ৩৫-৩৭

অধ্যায় ৩ : প্রতিশ্রুতির ৫৪ বছর – উন্নয়ন কোথায়? দুর্নীতি, অবহেলা ও বিপন্ন জাতি

১৫। চাঁদার রাজত্ব : সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও নীরব রাষ্ট্র ৩৮-৩৯

১৬। মন্ত্রীদের বিদেশে অবৈধ সম্পত্তির চিত্র ৩৯-৪০

১৭। সাধারণ মানুষের অন্যায় বন্দিত্ব ও দমননীতি ৪১-৪২

১৮। মাদ্রাসা ছাত্রীদের গ্রেপ্তার – জঙ্গি সন্দেহের আড়ালে RAW...........................৪২-৪৩

১৯। সাধারণ মানুষের ওপর রাজনৈতিক দমন-পীড়ন..৪৪

বিডিআর

৩১।“ইজ্জতহানীর শতক”: হাসিনার শাসনে নারীর আর্তনাদ………………………৭১-৭৪
৩২। এয়ারপোর্টে প্রবাসীদের মাল চুরি ও হয়রানি – ‘দেশের গর্ব’ অপমানের শিকার…৭৪-৭৫
৩৩। ৫৪ বছর পরও কেন বাংলাদেশ উন্নত দেশ নয়? … … … … … … … … … … … ৭৫-৭৬
৩৪। সামরিক অস্ত্র দুর্বলতা ও প্রতিরক্ষা খাতে দুর্নীতি……………………………৭৭-৭৮
৩৫। উন্নয়ন হবে কবে? কোন পথে উত্তরণের আশা………………………………৭৮-৮১
৩৬। শেষ কথা………………………………………………………………… ৮১-৮২

ব্রিটিশ [illegible]

বাংলাদেশের ইতিহাস শুরু হয় বহু যুগ আগে। ব্রিটিশ শাসনের সময় বাংলার অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিকশিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের ফলে বাংলা দুই ভাগে বিভক্ত হয়। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান নামে দুটি অংশ তৈরি হয়, কিন্তু সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য ছিল প্রচুর। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন হয়, যেখানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবিতে বিক্ষোভ গড়ে উঠে। এই আন্দোলনে শহীদদের ত্যাগ বাংলাদেশের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। পাকিস্তানি শাসকগণ বাংলার অধিকার হরণ করায় উত্তেজনা বেড়ে যায়। অবশেষে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, যা স্বাধীনতার পথ খুলে দেয়। এই যুদ্ধ ছিল এক মহান আত্মত্যাগ ও সাহসিকতার প্রতীক। বাংলাদেশের জন্মের এই সংগ্রাম আজও আমাদের জাতীয় আত্মপরিচয়ের মূল ভিত্তি।

ভাষা আন্দোলন ও জাতীয় চেতনা

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বাংলার মানুষকে দীর্ঘদিন শোষণ করে রেখেছিল। অর্থনৈতিকভাবে তারা কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নিঃস্ব করে দেয়। এরপর ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাজনের মাধ্যমে বাংলা বিভক্ত হয়ে পড়ে দুই অংশে —ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের গঠনের পরপরই ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে সংকট তৈরি হয়। বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় বাঙালি জনতার মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায় ঢাকার রাজপথ। ভাষার জন্য এই আত্মত্যাগ শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্ব ইতিহাসেও এক অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকে। এই আন্দোলন বাঙালির আত্মপরিচয়ের প্রথম প্রকাশ। এর মাধ্যমে জাতি বুঝে যায় — নিজের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে হয়।

স্বাধীনতার পূর্বে রাজনৈতিক আন্দোলন

১৯৫□ থেকে ১৯৬৯ এর মধ্যে বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের দাবি, ছয় দফা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান —সব কিছুই ছিল স্বাধীনতার পূর্বপ্রস্তুতি। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালির রাজনৈতিক চেতনা ক্রমশ জাগ্রত ও সংগঠিত হয়ে ওঠে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামে এক নৃশংস গণহত্যা শুরু করে। এর জবাবে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। নয় মাসের সেই সশস্ত্র সংগ্রামে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা □ এই যুদ্ধ শুধু একটি ভূখণ্ডের নয় —

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস রচিত হয়েছে লাখো মানুষের ত্যাগ, সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে। এই ইতিহাসের পাতায় একদিকে যেমন রয়েছে ভাষা শহীদদের রক্ত, তেমনি রয়েছে অগণিত অজ্ঞাতনামা মুক্তিযোদ্ধার নিঃশব্দ আত্মাহুতি, রাজনৈতিক নেতাদের দূরদর্শী কৌশল, এবং সাধারণ মানুষের অক্লান্ত সহায়তা। কিন্তু শেখ হাসিনার শাসনামলে এই বহুমাত্রিক ইতিহাসকে সংকুচিত করে একক ব্যক্তি-কেন্দ্রিক বর্ণনায় রূপান্তর করার এক ধারাবাহিক প্রয়াস চলে এসেছে—যেন স্বাধীনতা শুধুমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানের একক অর্জন, আর বাকিদের অবদান ইতিহাসের অন্ধকারে চাপা পড়ে থাকে।

ইতিহাসের পাতায় একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা: শেখ হাসিনার রাজনৈতিক প্রচারযন্ত্র এমনভাবে সক্রিয় হয়েছে যে, স্কুলের পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে গণমাধ্যম—সবখানেই শেখ মুজিবকে "স্বাধীনতার একমাত্র স্থপতি" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। শহীদ জিয়াউর রহমানের মতো ঘোষণাকারী সেনা কর্মকর্তার ভূমিকা, তাজউদ্দীন আহমদের মতো রাষ্ট্রনায়কের অবদান, বা মাওলানা ভাসানীর মতো জননেতার প্রেরণাদায়ী ভূমিকা—এসব কৌশলে উপেক্ষা করা বা বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা ভারতের সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন, যারা প্রবাসী সরকারের নীতি নির্ধারণে ভূমিকা রেখেছিলেন—তাদের নামও আজ পাঠ্যবই ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে প্রায় অনুপস্থিত। এতে নতুন প্রজন্ম স্বাধীনতার ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ চিত্র জানতে পারে না; বরং একপাক্ষিক গল্পের মধ্যে আটকে থাকে।

পাঠ্যপুস্তকে ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন:২০০৯ সালের পর থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রমে একাধিকবার পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এমন তথ্য মুছে দেওয়া হয় যা শেখ-মজিবকে "একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা"র পরিবর্তে "একমাত্র নেতা" হিসেবে দেখাতে

নামকরণ করে। কেউ বাবার নামে, কেউ স্বামীর নামে, আবার কেউ নিজের নামে—ফলে রাষ্ট্রীয় সম্পদ রাজনৈতিক ব্যক্তিপূজার হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

ইতিহাসের বহুমাত্রিক সত্য গোপনের ক্ষতি : একজন ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন, কিন্তু ইতিহাসের মালিকানা কখনো এক ব্যক্তির হাতে বন্দী হওয়া উচিত নয়। যখন একজন নেতাকে অতিমানব বানানো হয় এবং বাকিদের মুছে ফেলা হয়, তখন ইতিহাস তার সত্যতা হারায়। এর পরিণতি ভয়াবহ—জাতি একচোখা দৃষ্টিভঙ্গিতে বেড়ে ওঠে, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং নতুন প্রজন্ম অতীত থেকে সঠিক শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হয়।

ইতিহাস ফিরিয়ে আনার দায় : স্বাধীনতার ইতিহাস শুধু শেখ মুজিবের নয়—এটি শহীদ জিয়াউর রহমানের, তাজউদ্দীন আহমদের, সৈয়দ নজরুল ইসলামের, ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরীর, মাওলানা ভাসানীর, ট্রেনিং ক্যাম্পের হাজারো যোদ্ধার, মুক্তিকামী ছাত্র জনতার এবং সীমান্তে লড়াই করা অজ্ঞাতনামা নায়কদের। সত্যিকার ইতিহাস ফিরিয়ে আনা মানে হলো প্রতিটি অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া আর এই দায়িত্ব রাষ্ট্র, শিক্ষাবিদ ও নাগরিক সমাজের সম্মিলিতভাবে নিতে হবে।

মজলুম ভাসানী

১৮৮০ সালের ১২ ডিসেম্বর জন্ম গ্রহন করেন এবং ১৯৭৬ ১৭ই নভেম্বর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই দেশ বরেণ্য নেতা মৃত্যুবরণ করেন। ছিলেন বাঙালি জাতির এক অদ্বিতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ব্রিটিশ শাসন থেকে শুরু করে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত শোষিত কৃষক ও সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি নিরলস সংগ্রাম করেছেন। ১৮৮০ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার ধানগড়ায় জন্মগ্রহণকারী ভাসানী শৈশবে পিতামাতা হারিয়ে কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়েছেন। গ্রামের মক্তব থেকে শুরু করে দেওবন্দসহ বিভিন্ন মাদ্রাসায় ধর্মীয় উচ্চশিক্ষা অর্জনের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে গড়ে তোলেন। তার রাজনৈতিক জীবন শুরু থেকেই ছিল দারিদ্র্য, নিপীড়ন এবং অবিচারের শিকার মানুষের অধিকার রক্ষায় নিবেদিত[1]।

রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম

তিনি ছিলেন গরীব ও কৃষকের প্রকৃত বন্ধু। পেটের দায়ে একপর্যায়ে কৃষিকাজে যুক্ত হন এবং দিনমজুর হিসেবে শ্রম দেন[2]। ১৯৭১ সালের দৈনিক পয়গাম

ব্রিটিশ শাসনামলে আসামে কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বে ভাসানী শোষিত কৃষকের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন[3]। ১৯০৯ সালে তিনি ব্রিটিশ ও সামন্ত প্রভু বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী দলে যোগ দেন। একবার সেই দলের সঙ্গে মিলে একটি ভুট্টার গুদামে আগুন ধরিয়ে দেন, যার ফলে সিন্ডিকেট করা সমস্ত ভুট্টা পুড়ে যায়[4]। ১৯৪৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় তার অবদান অনস্বীকার্য[5]। এই সময় থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতিতে নিয়ে আসা এবং নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তিনি শেখ মুজিবকে রাজনৈতিক সহায়তা ও উৎসাহ দিয়ে তার রাজনৈতিক ভিত্তি গড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যা পরবর্তীতে শেখ মুজিবের পথচলায় এক অনন্য সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে[6]। এরপর ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি জাতীয় আওয়ামী পার্টি (NAP) প্রতিষ্ঠা করেন, যা বামপন্থী আদর্শ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতীক হয়ে ওঠে। ওই সম্মেলনে তার 'বিদায় পাকিস্তান' স্লোগান পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধের ইঙ্গিত বহন করে[5]।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে ভাসানীর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তিনি সামরিক শাসকের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উৎসাহিত ও সংগঠিত করেছিলেন। সেসময় টাইম পত্রিকা লিখেছিল, "ভাসানী ইনস্পায়ার্ড দ্য রায়টস দ্যাট ফোর্সড আইয়ুব খান টু রিজাইন," অর্থাৎ "ভাসানীর কারণে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়েছিল যা আইয়ুব খানকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল"[7]। তার সাহসিকতার পরিচায়ক স্বরূপ তিনি বলেছিলেন, "হোয়াট হ্যাভ আই টু ফিয়ার? আই উড ওয়েলকাম বিইং হ্যাংড ফর মাই পিপল," অর্থাৎ "আমার কিসের ভয়? আমি আমার মানুষের জন্য হাসি মুখে ফাঁসি বরণ করতে প্রস্তুত"[7]। কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তার সংগ্রাম ছিল অবিচল ও অবিস্মরণীয়।

আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতার পর শেখ মুজিব ক্ষমতায় আসার পর তিনি তার রাজনৈতিক গুরু ভাসানীসহ অন্যান্যদের অবদান ভুলে যান। শেখ মুজিব নিজের ক্ষমতাকে সুসংহত করতে গিয়ে তাদের প্রতি জুলুম করা শুরু করেন, যাদের অবদানে তিনি নেতা হয়েছিলেন [10]। শেখ মুজিব ভাসানীকে প্রতিপক্ষ ভাবতে শুরু করেছিলেন, যার ফলে তাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়[10]।

ভাসানী সরকারের দুর্নীতি ও ভারতের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় কথা বলেন [11]। তার ভারত বিরোধিতা স্পষ্ট ও দৃঢ় ছিল। তিনি বলেছিলেন, “পিন্ডির জিঞ্জির ছিন্ন করেছি দিল্লির দাসত্ব করবার জন্য নয়,” অর্থাৎ “পিন্ডির শেকল কেটেছি দিল্লির দাসত্ব করার জন্য নয়”[12], যা বাংলার মানুষের পাকিস্তান ও ভারত উভয়ের শোষণ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরে। তিনি চেয়েছিলেন বাংলার মানুষ নিজ ভাগ্য নিজের হাতে নিক এবং পররাষ্ট্র ও অভ্যন্তরীণ নীতিতে স্বাধীন ও সার্বভৌম হোক।

নিঃস্বার্থ জননেতা

মওলানা ভাসানী কখনো সরকারি ক্ষমতায় আসেননি। তাই ঐতিহাসিক প্রচার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তার অবদান যথাযথভাবে উঠে আসেনি। দলীয় রাজনীতির বাইরে কাজ করায় তাকে রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে। তিনি নিজের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে লিখিত কোনো নথি রাখেননি, যা পরবর্তী গবেষণায় অসুবিধার কারণ হয়েছে। স্বাধীনতার পর ক্ষমতাসীনদের সমালোচনা করায় তাকে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় থেকে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়।

১৯৭৬ সালের ১৬ মে ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে তিনি আপসহীনভাবে আন্দোলন করেন। ৯০ বছর বয়সী অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে লং মার্চ করেছিলেন।

---

[1] মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সৈয়দ আবুল মকসুদ, পৃষ্ঠা ৩২৪
[2] দৈনিক পয়গাম, সাক্ষাৎকার, ১৯৭১
[3] পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি ও আন্দোলন ঐতিহাসিক নথি সংকলন
[4] ব্রিটিশ আমলের বিপ্লবী আন্দোলন. সংকলন
[5] মওলানা ভাসানীর ১৯৭১ সালের মার্চ ভাষণ, সৈয়দ আবুল মকসুদ, পৃষ্ঠা ৩৯৪-৩৯৫
[6] বঙ্গবন্ধু ও ভাসানীর রাজনৈতিক সম্পর্ক, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ
[7] টাইম ম্যাগাজিন আর্কাইভ, ১৯৬৯
[8] মওলানা ভাসানীর ভূমিকা, ১৯৭১ সালের মার্চ, ইতিহাস সংকলন
[9] বাঙালি রাজনৈতিক নেতাদের জীবন ও আদর্শ. জাতীয় গ্রন্থাগার
[10] মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারা. গবেষণা প্রবন্ধ
[11] মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস, বিশ্লেষণমূলক গবেষণা
[12] শেখ মুজিবের রাজনৈতিক উত্থান ও ভাসানীর প্রভাব, গবেষণা প্রবন্ধ
[13] ভাসানীর জনমুখী রাজনীতি ও তার অবদান, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

ইতিহাস কখনো মুছে ফেলা যায় না। তাকে সাময়িকভাবে রঙিন ব্যাখ্যার ভেতরে লুকিয়ে রাখা গেলেও, সময়ের প্রবল ঢেউ একসময় তাকে অনাবৃত করে দেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসও তেমনি বহুদিন ধরে ঢেকে রাখা এক অনুচ্চারিত অধ্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে—যেখানে প্রশ্ন ওঠে: শেখ মুজিব কি আদৌ বাংলাদেশের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, না কি তিনি ছিলেন কেবল ক্ষমতার মঞ্চে ওঠার এক প্রবল প্রতিযোগীর নাম? শেখ মুজিব কখনোই পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে কল্পনাও করেননি। তার রাজনৈতিক কৌশল, বক্তব্য এবং দলীয় অবস্থান ছিল পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থা দখলের চেষ্টা মাত্র। তিনি একদিকে পাকিস্তানের প্রীতি লালন করতেন, আবার প্রয়োজনে ভারতের দ্বারস্থ হতেন—কখনো ইয়াহিয়া, কখনো ইন্দিরা—সবাই ছিল তার স্বার্থান্বেষী রাজনীতির সম্ভাব্য মোহরা। জনগণের জন্য নয়, বরং নিজের জন্যই তার এই কৌশলচালিত পদচারণা। ১৯৭০ সালে যখন দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তি স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন শেখ মুজিব সেই সময়কে ব্যবহার করেছিলেন এক পাতানো নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তান নয়—পুরো পাকিস্তানের শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেসময়ে আওয়ামী লীগের পোস্টারে স্পষ্টভাবে লেখা ছিল—

"আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ।"

এই পাকিস্তানপ্রীতির কারণে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি শেখ মুজিবকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন:

> "তুমি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন বাদ দাও, বাংলার সংগ্রামী বীর হও।

(বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭২১)

মুজিবকে সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার জন্য। কিন্তু সব অনুরোধ উপেক্ষা করে জাতিকে মৃত্যু ও অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়ে কাপুরুষের মতোই তিনি কারাবরণ করে চলে যান পশ্চিম পাকিস্তানে।”(মেজর ডালিম বলছি, পৃষ্ঠা ১৫)

যদিও প্রচলিত বর্ণনায় শেখ মুজিব কারাবণ করেছেন বলা হচ্ছে, কিন্তু Mosaic of Memory গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়:

“তিনি কোনো জেলে ছিলেন না। বরং একজন পাকিস্তানি মেজরের বাসায় নিরাপদে আশ্রয় নিয়েছিলেন।” এই পলায়নপর মানসিকতা যখন মুজিবের ছিল, তখন তার দলের অন্য নেতারা ভারতে পালিয়ে গিয়ে অবস্থান নেন।

কিন্তু শরণার্থী বা রাষ্ট্রনির্মাণের দায় নয় — ভারতে গিয়ে তারা মত্ত হন ভোগ-বিলাস আর দুঃসাহসিক অপকর্মে। বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর এম এ জলিল তাঁর বই “অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা”-তে লেখেন:“ভারতের মাটিতে অবস্থানকালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের চুরি, দুর্নীতি, অবৈধ ব্যবসা, যৌণ কেলেঙ্কারি, বিভিন্ন রূপ ভোগ-বিলাসসহ তাদের নানা অপকর্মের প্রচুর প্রামাণ্য দলিল ছিল” (পৃষ্ঠা ৪৯)

তিনি আরও মারাত্মক অভিযোগ তোলেন:> “শরণার্থী শিবির থেকে অসহায় যুবতী হিন্দু মেয়েদের কলকাতা শহরে চাকরি দেওয়ার নাম করে এনে, সেইসব আশ্রয়হীন মেয়েদের কলকাতার হোটেলে যৌণ তৃষ্ণা মেটাতে বিবেক দংশনবোধ করেনি তাদের [illegible]”(পৃষ্ঠা [illegible])

এই বর্ণনা শুধু রাজনৈতিক পতনের নয়, নৈতিক অধঃপতনের দলিলও বটে। একদিকে মুক্তিযুদ্ধের নামে সংগঠিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব আরেকদিকে বাস্তবে আত্মসমর্পণ, ভোগবিলাস ও বিকৃতি — এই ছিল সেদিনকার আওয়ামী নেতৃত্বের নগ্ন চিত্র। এইসব তথ্য দলিল বক্তব্য ও প্রেক্ষাপটের আলোকে চোখে আঙুল দিয়ে বলা চলে — শেখ মুজিব কখনোই ছিলেন না স্বাধীনতার প্রকৃত পথপ্রদর্শক। তিনি ছিলেন একজন কৌশলী রাজনীতিবিদ, যিনি সময়কে ব্যবহার করে নিজের

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করলেও পরবর্তী সময়েই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত নানা কৌশলে বাংলাদেশকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাগতভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে। স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই, যখন দেশজুড়ে অস্থিরতা ও প্রশাসনিক শূন্যতা বিরাজ করছিল, ভারত মুক্তিযুদ্ধের সহায়তার সুযোগে পাকিস্তানি বাহিনী রেখে যাওয়া বিপুল পরিমাণ অস্ত্র,

বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সরকারি গুদাম, ব্যাংক ও শিল্পকারখানা থেকেও বহু যন্ত্রাংশ, মূল্যবান সামগ্রী ও সম্পদ সরিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে, যা পরবর্তীতে বহু প্রত্যক্ষদর্শী, সাংবাদিক ও ইতিহাসবিদ নথিভুক্ত করেছেন। কিন্তু এই লুটপাটই ভারতের শোষণমূলক নীতির শেষ ছিল না। পরবর্তীকালে সীমান্ত হত্যা, 'পুশ-ইন' নীতি, রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও পানি আগ্রাসনের মাধ্যমে ভারত ক্রমাগতভাবে বাংলাদেশকে একপ্রকার পরোক্ষ উপনিবেশে পরিণত করতে সচেষ্ট থেকেছে।

সহযোগিতার আড়ালে ভারতের সম্পদ লুণ্ঠন -

১৯৭১ সালের দীর্ঘ সংগ্রামের পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভারতের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে এই সহযোগিতা নিখুঁত নির্ভেজাল বন্ধুত্ব ছিল না; বরং এটি ভারতের নিজস্ব স্বার্থ ও বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তারের কৌশলগত অংশ ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত যে অস্ত্র ও সরঞ্জাম দিয়েছিল, তা ছিল মূলত তার জাতীয় নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে। যুদ্ধ শেষে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের ভূখণ্ডে থাকা বিপুল পরিমাণ পাকিস্তানি অস্ত্রশস্ত্র, শিল্প কারখানা, সরকারি যন্ত্রপাতি ও আর্থিক সম্পদ আত্মসাৎ করে। এসবের পেছনে ছিল ভারতের স্বার্থসিদ্ধি এবং বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার। বিশ্বখ্যাত লেখক গ্যারি জে. ব্যাস তাঁর গ্রন্থ দি ব্লাড টেলিগ্রাম (২০১৩) এ উল্লেখ করেছেন,> "ইন্ডিয়ান ফোর্সেস (swiftly)সমুভড টু সিকিউর পাকিস্তানি অর্ডনেন্স, মাচ অব হুইচ নেভার রিটার্নড টু বাংলাদেশ'স মিলিটারি।" (ভারতীয় বাহিনী দ্রুত পাকিস্তানি অস্ত্র ও গোলাবারুদের দখল নেয়, যার অনেকটাই আর বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর হাতে ফিরে আসেনি) শুধু অস্ত্রশস্ত্র নয়, খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়ার শিল্পাঞ্চল থেকেও ভারতীয় সেনারা মেশিনারি ও কাঁচামাল লুট করেছে। লন্ডনের দ্য টাইমস পত্রিকা (১৯৭২ সালের জানুয়ারি) জানায়,

দ্য লিবারেটর , এসকেপট সিরিয়াস স্ক্রুটিনি ফর হোয়াট ইট টুক অ্যাওয়ে ফ্রম বাংলাদেশ। ”
(ভারত মুক্তিদাতা হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় , সে বাংলাদেশ থেকে যা নিয়েছে তা নিয়ে কোনো গভীর তদন্ত হয়নি।) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী ভারতের ভূমিকা নিয়ে ইতিহাসের বিশ্লেষণগুলোতে পরিষ্কার দেখা যায় , ভারতের সহযোগিতার পেছনে তার নিজস্ব স্বার্থ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারই প্রাধান্য পেয়েছিল। রকসেনা কুমার রায় এর হিস্টোরি অব বাংলাদেশ (২০১১):> “ভারত পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণের পর তাদের অবশিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম নিজেদের হাতে নিয়ে দ্রুত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তবে স্বাধীন বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর জন্য সেই অস্ত্র বেশিরভাগ ফেরত দেওয়া হয়নি। এই পদক্ষেপ ভারতের দক্ষিণ এশিয়ায় নিজের আধিপত্য বজায় রাখার কৌশলের অংশ ছিল।” মাইরন রি ’জ্জার্ডের বাংলাদেশ : আ লেগ্যাসি অব ব্লাড (১৯৮১): “ভারতীয় সেনারা মুক্তিযুদ্ধের সময় সামরিক সহযোগিতা দিলেও যুদ্ধ শেষে তারা বাংলাদেশ থেকে অবৈধ লুটপাটের মাধ্যমে অস্ত্র ও শিল্পসম্পদ নিয়ে যায়। এটি ছিল ভারতের দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক পরিকল্পনার অংশ, যার মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল। ”
সিদ্দিকি ও গুলজারের দি লিবারেশন ওয়ার অব বাংলাদেশ (১৯৯৭) "ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করলেও, যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্প ও অবকাঠামো লুট করে নিজের দেশের মুনাফায় নিয়োজিত ছিল। এটি ছিল একটি রূঢ় বাস্তবতা যা বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি করুণ অধ্যায়। ”
ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই লুটের বিষয়টি আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর এম এ জলিল তার বই অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা তে বর্ণনা করেছেন,পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত

প্রিয় পাঠক ! স্বাধীনতা মানে শুধু স্বাধীন ঘোষণা নয়; এটি হচ্ছে নিজের দেশের সম্পদ , অধিকারে সার্বভৌম কর্তৃত্ব বজায় রাখা। কিন্তু যখন সেই স্বাধীনতার পেছনে কাজ করা প্রতিবেশী দেশই দেশের অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্পদ লুটে নেয়, তখন ‘স্বাধীনতা ’ কতটা বাস্তব হয় ?

অত্যন্ত দুঃখজনক যে , স্বাধীন দেশে সর্বপ্রথম ভারতীয় সেনাদের কর্তৃক গুমের শিকার হতে হয় একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে —মেজর এম এ জলিলকে। তিনি ভারতীয় সেনাদের লুটপাটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কারণে গুম হন। এই ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় , স্বাধীনতার পরেও দেশের স্বার্থে সরাসরি কথা বলা ও প্রতিবাদ করা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। মেজর এম এ জলিলের সাহস ও বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের দায়িত্ব হলো তার মত মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি রক্ষা করা এবং এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সতর্ক থাকা। স্বাধীনতার সঠিক রক্ষাকর্তা হওয়ার জন্য আমাদের স্বচ্ছ ও সজাগ থাকতে হবে।

উপসংহার : ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতায় সহযোগিতা করলেও তা ছিল দ্বৈতমুখী। মুক্তিযুদ্ধের সময় ও পরে ভারতের নিজস্ব স্বার্থ ও দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশের অস্ত্র , শিল্প , অর্থ ও অন্যান্য সম্পদ লুণ্ঠন করা হয়। এই বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। জাতি হিসেবে আমাদের দায়িত্ব এই ইতিহাস সচেতনভাবে জানতে এবং নিজেদের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সর্বোচ্চ সচেতনতা ও ঐক্যবদ্ধ থাকার। —১

সীমান্ত হত্যা (কাঁটাতারে ঝুলিয়ে রাখা)

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (BSF) কর্তৃক বাংলাদেশি নাগরিকদের গুলি করে হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের নজির স্থাপন করেছে। ২০০০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ১ ২৩৬ জন বাংলাদেশি নিহত এবং ১ ১৪৫ জন আহত হন BSF-এর গুলিতে। সূত্র: আইন ও সালিশ কেন্দ্র (ASK) Human Rights Watch ২০১০ ও ২০১১ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে

ভারতের দ্বারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ থেকে লুণ্ঠিত সম্পদের আনুমানিক পরিমাণ ছিল :ডলারে:* প্রায় *৩৮ কোটি মার্কিন ডলার * বাংলাদেশি টাকায় (১৯৭১ সালের হার অনুযায়ী ১ USD = ৭.৫ টাকা): [illegible]৭১ কোটি টাকা (তৎকালীন মুদ্রামান অনুযায়ী)
বি.দ্র. এই হিসাব আনুমানিক ও বিতর্কিত নির্ভরযোগ্য সরকারিভাবে স্বীকৃত সূত্রে এই সংখ্যা নিশ্চিত নয়। কোন কোন তথ্য মতে :১৯৭১ সালের হার এই অনুযায়ী ১ মার্কিন ডলার = ৭.৭৬ টাকা (বাংলাদেশি), তাহলে, ২.২ বিলিয়ন ডলার × ৭.৭[illegible] = প্রায় [illegible]০৭ কোটি টাকা (১৯৭১ সালের টাকায়) এটি একটি আনুমানিক হিসাব, সঠিক বিনিময় হার ও মূল্যস্ফীতি অনুসারে সামান্য ভিন্ন হতে পারে।

তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও নিন্দা : – ফেলানির হত্যাকাণ্ড জাতিসংঘসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার নজরে আসে। – Amnesty International একে "সীমান্ত নিরাপত্তার নামে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড " হিসেবে আখ্যা দেয়। – South Asian Human Rights Forum এই ঘটনাকে দক্ষিণ এশিয়ায় সীমান্ত বর্বরতার প্রতীক বলে উল্লেখ করে।

বাংলাদেশ সরকারের প্রতিক্রিয়া -

ফেলানি হত্যার বিচার দাবিতে বাংলাদেশ সরকার একাধিকবার কূটনৈতিক প্রতিবাদ জানায়। দুই দেশের সীমান্ত বৈঠকে বারবার এই বিষয়ে আলোচনা হলেও কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি ভারত। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একে “সীমান্তে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন ” বলে বিবৃতি দেয়। BSF-এর ভূমিকা ও দায়হীনতা : – ফেলানির হত্যাকারী বিএসএফ সদস্য অমিয়ত ঘোষকে দুই দফা ভারতীয় বাহিনীর নিজস্ব আদালতে বিচার করা হয় , এবং দুবারই তাকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। বিচার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে প্রশ্ন ওঠে। এ রায় শুধু বাংলাদেশ নয় , বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার কর্মীদের হতাশ করে।

সাংবাদিকতা ও গণআন্দোলন -

বাংলাদেশে ফেলানির হত্যাকাণ্ড ঘিরে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবাদ হয়। বহু কবিতা , প্রবন্ধ ও আলোকচিত্রের মাধ্যমে ফেলানির স্মরণ ও ন্যায়বিচারের আহ্বান জানানো হয়। ২০১৪ সালে ফেলানিকে নিয়ে নির্মিত একটি ডকুমেন্টারি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়। ফেলানি হত্যার এক দশকের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও সীমান্তে গুলি করে হত্যার প্রবণতা বন্ধ হয়নি। আইন ও সালিশ কেন্দ্র ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বারবার বাংলাদেশি অসহায় নাগরিকদের বিরুদ্ধে এই সহিংসতার বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে ভারতের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে "non-

করে গ্রামে ঢুকে তিনজনকে গুলি করে হত্যা করে ও একজনকে ধরে নিয়ে যায়।

এসব ঘটনায় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে এবং সীমান্তে স্থায়ীভাবে আতঙ্ক বিরাজ করে।

Push-in’ নীতি : সীমান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘন -

ভারত বহুবার বাংলাদেশি মনে করে এমন মানুষদের —বিশেষ করে মুসলিম অভিবাসীদের —জোর করে সীমান্ত পার করিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে দিয়েছে , যা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী Refoulement বা অবৈধ প্রত্যাবাসন হিসেবে গণ্য হয়। এই প্রক্রিয়া ১৯৫১ সালের জাতিসংঘ শরণার্থী কনভেনশন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনসমূহের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। Refoulement বলতে বোঝায়, কোনো ব্যক্তিকে এমন দেশে ফেরত পাঠানো , যেখানে তার জীবনের নিরাপত্তা বা মৌলিক অধিকার হুমকির মুখে পড়তে পারে। ভারতের অভ্যন্তরে বিশেষ করে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম অভিবাসীদের ‘অবৈধ বাংলাদেশি ’ হিসেবে চিহ্নিত করে জোরপূর্বক বাংলাদেশ সীমান্তে ঠেলে পাঠানোর অভিযোগ রয়েছে। অনেক সময় এসব মানুষদের কোনো পরিচয়পত্র থাকে না , আবার কেউ কেউ প্রকৃতপক্ষে ভারতেই জন্মগ্রহণ করেছে। তথাপি , রাজনৈতিক ও জাতিগত উদ্দেশ্যে তাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় , যা মানবিক ও কূটনৈতিক উভয় বিবেচনায় চরম উদ্বেগজনক। ২০২১ সালে ত্রিপুরা সীমান্তে এমনই একটি ঘটনায় , ৩১ জন রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা করে ভারত , যা নিয়ে তৎকালীন সময়ে দ্বিপক্ষীয় উত্তেজনা দেখা দেয়। ভারত এদেরকে বাংলাদেশ থেকে আগত বলে দাবি করলেও, বাংলাদেশ সরকার তাদের স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে তারা সীমান্তে আটকা পড়ে এবং একটি মানবিক সংকট তৈরি হয়, যা আন্তর্জাতিকভাবে refoulement-এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই প্রক্রিয়া শুধু

অবৈধ অনুপ্রবেশকারী’ হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চালানো হয়। আন্তর্জাতিক মহলে জাতিসংঘ, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ বিভিন্ন সংস্থা ভারতের এই refoulement নমানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন বলে নিন্দা এই প্রেক্ষাপটে, এই অবস্থা বাংলাদেশের ভৌগোলিক নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবৈধভাবে ঠেলে পাঠানো জনস্রোত শুধু জনসংখ্যাগত ভারসাম্যই বিনষ্ট করে না, বরং তা দেশের সামাজিক ঐক্য, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকেও মারাত্মকভাবে ঝুঁকির মুখে ফেলে।
উপসংহার: ভারতের এই অবৈধ প্রত্যাবাসন এবং সীমান্তে ঠেলে পাঠানোর কৌশল এক ভয়াবহ রাষ্ট্রীয় আচরণে পরিণত হয়েছে, যা কেবল মানবিক নয়, রাজনৈতিক ও কৌশলগতভাবে বাংলাদেশকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যপ্রসূতও হতে পারে। এই অবস্থা বাংলাদেশের ভৌগোলিক নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এখন সময় এসেছে বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহলে জোরালোভাবে উপস্থাপন করার—যাতে ভারতের refoulement নীতিকে আন্তর্জাতিক চাপ ও জবাবদিহির আওতায় আনা যায় এবং বাংলাদেশের সীমান্ত ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা নিশ্চিত করা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ – রাজনীতি , দুর্নীতি ও জনগণের অধিকার

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর—বিজয়ের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে সারা দেশ উল্লাসে ফেটে পড়েছিল। এ বিজয় ছিল কেবল ভূখণ্ডের স্বাধীনতা নয়; ছিল সামাজিক ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও মানবিক মর্যাদার স্বপ্নপূরণের প্রত্যয়। কিন্তু স্বাধীনতার সেই সূর্য উদিত হওয়ার পর খুব দ্রুতই ঘনিয়ে আসে রাজনৈতিক অন্ধকার। শুরু হয় ক্ষমতার কুৎসিত খেলা, আদর্শের অবক্ষয়, এবং জনস্বার্থ উপেক্ষার এক করুণ অধ্যায়। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের দায়িত্ব তখনকার নেতৃত্বের কাঁধে বর্তায়। জনগণ প্রত্যাশা করেছিল একটি সহানুভূতিশীল, গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, সেই নেতৃত্ব একপর্যায়ে গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করে নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েমে মনোযোগী হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রক্ষমতা ধীরে ধীরে একটি পরিবারের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। বহুদলীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ, বিচারব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা এবং প্রশাসনে চরম দলীয়করণ—এসবই প্রমাণ করে, সে সময়কার সরকার রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা নয়, বরং ব্যক্তিপূজা ও ক্ষমতার অপব্যবহারে বেশি মনোযোগী ছিল। সর্বত্র দুর্নীতি, আত্মীয়প্রীতি ও প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা ঘনীভূত হতে থাকে। দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রিসভা ও দলের নেতারা রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাটে জড়িয়ে পড়ে, যা জনমনে প্রবল হতাশা ও ক্ষোভের জন্ম দেয়। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব, কৃষিপণ্যের সংকট এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পেছনে যেমন ছিল প্রাকৃতিক ও আন্তর্জাতিক কারণ, তেমনি ছিল দুর্বল নীতি, অপশাসন ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতা। রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন মানুষের ক্ষুধা মেটাতে ব্যর্থ হয়, তখন জনসাধারণের আস্থার ভীত কেঁপে ওঠে। এই অস্থির ও

স্বৈরতান্ত্রিক পরিস্থিতি চূড়ান্ত রূপ নেয়

পরিবর্তে দলীয় আনুগত্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে গণতন্ত্রের ভিত্তি আরও দুর্বল হয় এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা আরও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়ে। এই প্রথম দশকে, বাংলাদেশ পরিণত হয় এক আদর্শহীন, বিভক্ত, এবং অবিশ্বাসে ভরা জাতিতে। জনগণের প্রত্যাশা ছিল মুক্তি, কিন্তু তারা পেয়েছিল স্বৈরতন্ত্র; তারা চেয়েছিল গণতন্ত্র, কিন্তু পেয়েছিল দলতন্ত্র; তারা চেয়েছিল ন্যায়বিচার, কিন্তু পেয়েছিল দুর্নীতি ও দমননীতি। এই ইতিহাস কেবল একটি সময়ের নয়, বরং একটি জাতির আত্মবিশ্লেষণের আয়না। স্বাধীনতা অর্জনের পর যদি রাষ্ট্র তার নৈতিকতা হারায়, শাসকগণ যদি স্বচ্ছতা ও জনগণের প্রতিনিধিত্বকে অবহেলা করে, তবে স্বাধীনতা কেবল ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকে—চেতনায় নয়। অতএব, বাংলাদেশের প্রথম দশক ছিল আশার বিপরীতে বাস্তবতার সংঘর্ষ, আদর্শের বিপরীতে ক্ষমতার দম্ভ, আর গণমানুষের স্বপ্নভঙ্গের এক করুণ প্রতিচ্ছবি। ভবিষ্যতের পথরেখা নির্ধারণে এই অধ্যায়ের শিক্ষা জাতির জন্য অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য।

উপসংহার: শিক্ষণীয় বার্তা: স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দশক ছিল এক চরম দ্বন্দ্বময় সময়—যেখানে আশার মুখোমুখি হয়েছিল বাস্তবতার নিষ্ঠুরতা, এবং আদর্শের মুখোমুখি হয়েছিল ক্ষমতার লালসা। গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি একপর্যায়ে রূপ নেয় একদলীয় শাসনে, প্রশাসনে ন্যায়ের বদলে স্থান পায় দলীয় আনুগত্য, আর রাষ্ট্রপরিচালনায় সেবার বদলে প্রতিষ্ঠিত হয় আত্মীয়প্রীতি ও দুর্নীতি। জনগণের কণ্ঠরোধ, সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ, ও বিরোধী মত দমন—সব মিলিয়ে স্বাধীনতার যে মর্মবাণী ছিল, তা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে এক গভীর বার্তা রেখে যায়—রাষ্ট্রের ভিত কখনোই ব্যক্তিপূজা, ক্ষমতার কুন্দল বা একদলীয় একনায়কতন্ত্রের উপর দাঁড়াতে পারে না। গণতন্ত্র, জবাবদিহি, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং নৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্র দ্রুতই হয়ে

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ এক ভয়াবহ ট্র্যাজেডি যা সদ্য স্বাধীন দেশের জনগণের সামনে রাষ্ট্রের অক্ষমতা ও নিষ্ঠুরতা নগ্নভাবে উন্মোচিত করেছিল। জাতির মুক্তির স্বপ্ন দেখানো একটি রাষ্ট্রমাত্র তিন বছরের মাথায় নিজ দেশের হাজার হাজার মানুষকে অনাহারে মরতে বাধ্য করেছিল। সেই সময়ে ভয়াবহ বন্যা, প্রশাসনিক দুর্নীতি, খাদ্য বিতরণে বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক উদাসীনতা মিলে পরিস্থিতিকে ঘনীভূত করে তোলে। খাদ্যশস্য উৎপাদন কমে গেলেও সরকারের কাছে যথেষ্ট মজুদ ছিল কিন্তু

ভিত্তিতে জানা যায় —এই দুর্ভিক্ষে প্রায় ১ .৫ থেকে ২ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। তবে সরকারি হিসেবে মৃত্যুসংখ্যা দেখানো হয় মাত্র ২৭ ,০০০ জন, যদিও এই সংখ্যা বাস্তবতার তুলনায় অনেক কম বলে ধরা হয়। UNICEF ও FAO-এর তথ্যমতে , শিশুদের মৃত্যুহার এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে ঢাকার বিভিন্ন ফুটপাতে মা -বাবা সন্তানদের লাশ রেখে চলে যেতেন , কেননা তাদের কবর দেওয়ার সামর্থ্যও ছিল না। মানুষ যখন অভুক্ত , তখন সরকার দুর্ভিক্ষের তথ্য চেপে রেখে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করে। দেশের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকাকে সরাসরি নির্দেশ দেওয়া হয় —খাদ্যসংকট , মৃত্যু , ও ভিক্ষুকদের ভিড় নিয়ে যেন কোনও সংবাদ প্রকাশ না করা হয়। অথচ আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম যেমন The Guardian, The New York Times, Washington Post প্রকাশ করেছিল —বাংলাদেশে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ক্ষুধার্ত মানুষের লাশ পড়ে থাকছে , শিশুরা কাঁদছে মায়ের স্তন্য না পেয়ে , পিতারা সন্তান ফেলে আত্মহত্যা করছে। এ অবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে যিনি ছিলেন , তিনি দুর্ভিক্ষের দায় নিতে রাজি হননি। বরং জনগণকে দোষারোপ করে বলেন —“আমার দেশে গরিব আছে , কিন্তু কেউ না খেয়ে মরেনি। ” এই বক্তব্য বাস্তবতা থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন ছিল যে , তা জনগণের ঘৃণা আর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিন্দা কুড়ায়। দেশব্যাপী মানুষ মরছে , আর সে সময় তিনি তাঁর জন্মদিন পালন করেন ঢাকায় বিশাল আয়োজনের মাধ্যমে। ১৯৭৪ সালের ১৭ই মার্চ ঢাকায় রাষ্ট্রীয় খরচে আয়োজন করা হয় জন্মোৎসব —আতশবাজি, কেক, র্যালি , এবং দামী ব্যাংকুয়েট , যখন একই সময়ে রাস্তায় ক্ষুধার্ত শিশু চিৎকার করতে করতে মারা যাচ্ছিল। জাতি যখন অনাহারে , তখন শাসক উৎসবে মত্ত —এই বিভৎস বৈপরীত্য ইতিহাসে কালো অক্ষরে লেখা থাকবে। দুর্ভিক্ষের এই সময়কালে রাষ্ট্র খাদ্য রপ্তানি না করে চুপচাপ বসে থাকে। ভারতও কোনো সহায়তা করে না ,আর যুক্তরাষ্ট্র খাদ্য সাহায্য স্থগিত করে দেয় —কারণ কিউবার পক্ষে একটি ভোট দেওয়ায় আমেরিকা বাংলাদেশকে

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা বারবার বিপন্ন হয়েছে সেইসব ক্ষমতালোভী শাসকের হাতে, যারা জনগণের ভোটাধিকারকে পণ্যে পরিণত করে, রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করেছে ভোট ডাকাতির যন্ত্র হিসেবে। স্বাধীনতার পর জাতির যে স্বপ্ন ছিল—একটি গণতান্ত্রিক, ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র—তা বারবার ভেঙে চূর্ণ হয়েছে নির্বাচনী প্রহসনের মুখে। শেখ মুজিবুর রহমান থেকে শুরু করে শেখ হাসিনা পর্যন্ত ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ বারবার ভোট চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত, যার দলিল পাওয়া যায় ইতিহাসের পাতায়, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণে ও প্রত্যক্ষ ঘটনাপ্রবাহে। ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনই ছিল বিতর্কিত। সরকারদলীয় আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, কিন্তু বিরোধী দলসমূহ অভিযোগ করে যে এই নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি,জাল ভোট ও প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব হয়েছে। ঐ সময় শেখ মুজিব রাষ্ট্রীয় হেলিকপ্টার ব্যবহার করে নির্বাচনী প্রচার চালান, যা নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার প্রশ্ন তোলে। এই নির্বাচনের পর ১৯৭৪ সালে সংঘটিত হয় মারাত্মক দুর্ভিক্ষ ও শাসনব্যবস্থার চরম ব্যর্থতা। জনগণের আস্থা দ্রুতভিত্তিতে নষ্ট হয়। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয় যে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের একাংশ নিজ দলের মধ্যে বিভাজন ঘটিয়ে প্রতিবাদে নেমে পড়ে। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব একদলীয় শাসনব্যবস্থা (বাকশাল) চালু করেন, সব দল নিষিদ্ধ করে রাজনৈতিক মতপ্রকাশকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেন। এতে গণতন্ত্রের শেষ নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়। এক সময়ের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত নেতা, রাষ্ট্রকে নিয়ে নেন একদলীয় দমনমূলক শাসনের দিকে। এরপর বারবারই নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে।

সংস্থা Freedom House বাংলাদেশকে “partly free” থেকে “not free” রাষ্ট্রের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। নিউ ইয়র্ক টাইমস জানায় :“Polling booths were sealed, results were declared before voting ended, and the ruling party won with supernatural margins.”

("ভোটকেন্দ্রগুলি সিল করে দেওয়া হয়েছিল, ভোট শেষ হওয়ার আগেই ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছিল, এবং ক্ষমতাসীন দল অতিপ্রাকৃত ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেছিল। ")

২০২৪ সালের নির্বাচন তার চেয়েও বিস্ময়কর। বিরোধী দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়ন বাতিল, রাজনৈতিক গ্রেফতার, সংবাদপত্র ও ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ —সব মিলিয়ে একটি একচেটিয়া শাসনকে স্থায়ী করার লক্ষ্যে ভোট ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ পরিহাসে পরিণত করা হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাতিসংঘ এবং যুক্তরাষ্ট্র কোনো পর্যবেক্ষক না পাঠিয়ে সরাসরি আস্থা প্রত্যাহার করে নেয়। এইভাবে ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয় হেলিকপ্টার, রাতের ব্যালট ভর্তি, প্রশাসনিক দমন এবং আইনগত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। গণতন্ত্র কেবল নির্বাচন নয়, এটি জবাবদিহিতার কাঠামো। [1] ভোট চুরি মানে শুধু একদিনের প্রতারণা নয়, এটি রাষ্ট্রকে জনগণের শত্রুতে পরিণত করার প্রথম পদক্ষেপ। একদলীয় আধিপত্য কায়েমের এই প্রচেষ্টা গণতন্ত্রের নিকাশঘরে নিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশকে। এই দেশ আজ বন্দি। বন্দিদশা তৈরি করেছে যারা, তারা ভোট ডাকাত হিসেবেই ইতিহাসে চিহ্নিত থাকবে। কিন্তু একদিন জনগণের বিবেক ও প্রতিরোধই সেই বন্দিদশা থেকে মুক্ত করবে এই রাষ্ট্রকে। কারণ, সত্যকে যেমন গুলি দিয়ে হত্যা করা যায় না, তেমনি জনগণের ভোটাধিকার চিরকাল বন্দি রাখা যায় না।

স্বাধীনতার পর দেশের মানুষের প্রত্যাশা ছিল একটি মুক্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ রাষ্ট্রব্যবস্থা, যেখানে জনগণের মত প্রকাশের অধিকার থাকবে, রাষ্ট্র পরিচালনায় থাকবে জবাবদিহিতা, আর শোষণহীন একটি সমাজ গড়ে উঠবে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতায় এসে রাষ্ট্রের সব স্তরে যে কর্তৃত্ববাদী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, তা বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম সুসংগঠিত স্বৈরতন্ত্রের রূপ নেয়। তিনি রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, সংবাদমাধ্যম বন্ধ করে দেন, বিরোধীদের গুম-খুন করেন এবং সমালোচনাকারীদের কারাগারে পাঠিয়ে নিজেই হয়ে ওঠেন স্বৈরাচারের প্রতীক।

 Partly Free (আংশিক স্বাধীন): কিছু অধিকার আছে, [illegible] নির্বাচন, গণমাধ্যম, মতপ্রকাশ — সব কিছু সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত।

 Not Free (স্বাধীন নয়): কোনো প্রকৃত স্বাধীনতা নেই। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে সবকিছু, ভোট ও মানুষের জীবন।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি তিনি সংবিধান সংশোধন করে 'বাকশাল' গঠন করেন। এই ব্যবস্থায় সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বাতিল করে মাত্র চারটি সরকার অনুমোদিত পত্রিকা চালু রাখা হয়। জেলা প্রশাসকদের দেওয়া হয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উভয় ক্ষমতা। এভাবে একটি মুক্তচিন্তা ও বিরোধী মতশূন্য রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা নয়, বরং শাসকের প্রতি আনুগত্যই হয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্রের মূলনীতি। এই সময় রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের অন্যতম ভয়ংকর হাতিয়ার ছিল রক্ষীবাহিনী। এ বাহিনীর সদস্যরা প্রকাশ্য দিবালোকে লোক ধরে নিয়ে যেত, গুলি করত, খুন করত—কোনো বিচার ছাড়াই। রাজনৈতিক বিরোধী, সাংবাদিক, এমনকি সাধারণ মানুষ যারা সরকারের সমালোচনা করত, তাদের অনেকে গুম হয়ে যেত বা নিহত হতো। 'শত্রুরা দেশবিরোধী', 'ষড়যন্ত্রকারী' ইত্যাদি তকমা দিয়ে তাদেরদমন করা হতো। মানুষের মাঝে এক ভয়াবহ ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়। শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসাই নয়, দুর্নীতিও ছিল চরম। দেশের বিত্তশালী ও ক্ষমতাসীন শ্রেণির অসৎ রাজনীতির তীব্র বিকাশ ঘটে। এ সময়ের একটি কালো অধ্যায় ছিল সিরাজ সিকদারের হত্যাকাণ্ড, যা স্বৈরাচারী শাসনের ভয়াবহতার আরেক নিদর্শন। সিরাজ সিকদার ছিলেন একজন উজ্জ্বল সমাজসেবক ও রাজনৈতিক কর্মী, যিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বহু ত্যাগ স্বীকার করে দেশ ও জনগণের জন্য নিবেদিত ছিলেন। কিন্তু তিনি শেখ মুজিবের সরকারের তীব্র সমালোচক ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে কথা বলায় শাসকগোষ্ঠীর ক্ষিপ্ত হয়েছেন। ১৯৭৪ সালের দিকে তাকে নিষিদ্ধ করা হয় এবং পরে তিনি নিখোঁজ হন। বিশ্বাসযোগ্য সূত্র অনুসারে, সিরাজ সিকদারের হত্যায় সরাসরি শেখ মুজিবের নাম জড়িত ছিল, কারণ তার দমনের জন্য এই নির্মম কাজ করা হয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ড একদিকে ছিল শাসনের বিরুদ্ধে উন্মুক্ত প্রতিবাদের নিদর্শনকে দমন করার প্রচেষ্টা, অন্যদিকে এক প্রকার রাজনৈতিক শাসনকে ভয় দেখানোর

১৬ আগস্ট ১৯৭৫ সংখ্যায় লিখে : The streets of Dhaka remain unusually calm. No mass protest or spontaneous mourning was observed. Many citizens expressed relief privately, citing years of repression and fear."

(ঢাকার রাজপথ অস্বাভাবিকভাবে শান্ত। কোনো গণবিক্ষোভ বা স্বতঃস্ফূর্ত শোক দেখা যায়নি। অনেক নাগরিক ব্যক্তিগতভাবে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন , কারণ তাঁরা বহুদিন ধরে দমন -পীড়নের শিকার ছিলেন।) একইভাবে The Times of London উল্লেখ করে :> "Mujib’s fall came not with fire from below, but with a silent nod from an exhausted nation. People did not cry. They had long stopped believing."

(মুজিবের পতন নিচ থেকে কোনো বিদ্রোহে নয় , বরং ক্লান্ত জাতির একটি নীরব সম্মতিতে ঘটে। মানুষ কাঁদেনি —তারা বহু আগেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল।) এই পরিস্থিতি প্রমাণ করে —রাষ্ট্রীয় দমন ও দুর্নীতি দিয়ে একটি সমাজকে চিরকাল স্তব্ধ রাখা যায় না। যতই রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যম ‘জনতার নেতা ’ হিসেবে শেখ মুজিবকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় , বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। জনগণের মধ্যে তাঁর প্রতি ছিল ভয় , ক্ষোভ , ক্লান্তি —ভালোবাসা বা আস্থা নয়। শেখ মুজিব ইতিহাসে একদিকে স্বাধীনতার ঘোষণাকারী হলেও , স্বাধীন দেশের সবচেয়ে বড় নিপীড়ক হিসেবেও তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন। তিনি সংবাদপত্র , রাজনীতি , প্রশাসন , বিচার বিভাগ —সবকিছু নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে যে ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন , তা ছিল একটি দলীয় , পরিবারতান্ত্রিক , নিপীড়নমুখী রাষ্ট্র। তার করুণ পরিণতি ছিল সেই ভুল শাসনেরই অনিবার্য ফল। উপসংহার . ’শেখ মুজিবের একদলীয় শাসন ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের ইতিহাস থেকে স্পষ্ট হয় ; ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণ ও জনমতের অবজ্ঞা একটি জাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। স্বাধীনতার সোনালী স্বপ্ন যদি শাসকের কর্তৃত্ববাদ ও নিপীড়নের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালিত হয় , তাহলে সে

“জাতির পিতা ” শব্দটি শুধু একটি সম্মানসূচক উপাধি নয়, এটি একটি ঐতিহাসিক , আদর্শিক ও নৈতিক ভিত্তির দাবিদার অভিধা। এই উপাধি যার প্রতি আরোপ করা হয় তার হতে হয় জাতির আদর্শিক ভিত্তির স্থপতি, সর্বজনস্বীকৃত নেতা এবং সেই জাতির অস্তিত্বের মূল রূপকার। এই প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবুর রহমানকে “বাঙালি জাতির পিতা ” বলা কতটা যৌক্তিক সেটি নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা আবশ্যক

প্রথমত

শুধু বাংলাদেশের জনগণকে বোঝানো হয় না। বরং বাংলা ভাষাভাষী মানুষের বিস্তৃতি রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ , ত্রিপুরা , আসাম, ঝাড়খণ্ড , বিহার , এমনকি বিশ্বের নানা দেশে। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় – ভারতীয় বাঙালিরা কি শেখ মুজিবকে পিতা হিসেবে মানে ? বাস্তবতা হলো , পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা তাঁকে রাজনৈতিক নেতা বললেও পিতা স্বীকৃতি দেয় না। সুতরাং শেখ মুজিব কখনোই "বাঙালি জাতির সর্বজনীন পিতা " হতে পারেন না। তিনি হতে পারেন বাংলাদেশের একটি অংশের নেতা , তবে জাতির একক রূপকার নন।
দ্বিতীয়ত , তিনি কি বাঙালি জাতির জন্মদাতা ? বাংলা ভাষা ও জাতিসত্তার শুরু তো হয়েছে বহু শতাব্দী আগে। বাংলা ভাষার উত্থান হয়েছে চণ্ডীদাস , কৃত্তিবাস , বাল্মীকির রামায়ণ অনুবাদ , লালন, কবি আলাওল, কবি কায়কোবাদ , রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মতো অসংখ্য মনীষীর হাতে। বাঙালি জাতির আত্মবোধ তৈরি হয়েছে ভাষা আন্দোলন , ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম , ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ , তিতুমীরের লড়াই , সিপাহী বিপ্লব ইত্যাদির ধারায়। শেখ মুজিব এই ধারার একজন রাজনৈতিক নেতা , জাতির নির্মাতা নন।
তৃতীয়ত , যিনি জাতির পিতা হবেন , তার হতে হবে অনন্য নৈতিক আদর্শের প্রতীক। অথচ ১৯৭২ -৭৫ সালে তাঁর শাসনামলে বাকশাল প্রতিষ্ঠা , গণতন্ত্র হত্যা , সংবাদপত্র বন্ধ , হাজার হাজার বিরোধী নেতাকর্মী গুম -খুন , এবং দুর্ভিক্ষে লাখো মানুষের মৃত্যুর মতো ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। এসব ইতিহাসে কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। এক পিতা জাতিকে আশ্রয় দেন , ভয় নয়। একজন পিতা জাতির জন্য জীবন দেন , কিন্তু একচ্ছত্র ক্ষমতার জন্য নয়।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় , জাতির পিতা শব্দটি মুসলমানদের জন্য ভিন্ন একটি অর্থ বহন করে। মুসলিম জাতির পিতা হিসেবে যিনি সর্বজনস্বীকৃত , তিনি হলেন হজরত ইব্রাহিম (আঃ)। আল্লাহ তা ’আলা কুরআনে ঘোষণা করেন: “তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের ধর্মের অনুসরণ করো। তিনিই তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন। ”(সূরা

আযম, মাওলানা আব্দুর রহীম, ভাষা শহীদ দবিরুল, মতিউর রহমান মালিক, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী বগুড়া, আবুল হাশিম, আতাউর রহমান খান – এ সকল ব্যক্তিত্বের অবদানও এই জাতি গঠনে অপরিসীম।

তাদের কেউই "জাতির পিতা" শিরোপা পাননি। তাহলে একজন ব্যক্তিকে একচ্ছত্রভাবে "জাতির পিতা" বলে কি ইতিহাসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে না? অতএব, "জাতির পিতা" একজনই – তিনি হজরত ইব্রাহিম (আঃ)। শেখ মুজিব কোনোভাবেই সেই পিতৃত্বের মর্যাদা ধারণ করেন না। ইতিহাস, ধর্ম ও যুক্তি – সবদিক থেকেই এই দাবি অগ্রহণযোগ্য ও বিভ্রান্তিকর। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এখন সময় এসেছে এই মিথ্যাচার ও রাজনৈতিক রূপকথার মুখোশ উন্মোচনের।

স্বাধীনতা একদিনে [illegible]। হাজার বছরের স্বপ্ন দীর্ঘ আন্দোলন অসংখ্য প্রাণের ত্যাগের ফলই স্বাধীন রাষ্ট্র। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই ত্যাগের রঙ লাল —রক্তিম, পবিত্র। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ —সবটুকু সময় জুড়ে বাংলার মানুষ বুকের রক্ত দিয়ে লাল করেছে এই মাটিকে, এই পতাকাকে। সেই রক্তের রঙ পাল্টেছে বারবার —রাজনৈতিক ব্যাখ্যায়, দলের প্রয়োজন অনুযায়ী। কিন্তু যে শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই রক্ত, সেই শাসনের রূপ বদলায়নি। বরং কৌশল পাল্টেছে, কিন্তু দমনপীড়নের ধারা বহাল থেকেছে —শেখ মুজিব থেকে শেখ হাসিনা পর্যন্ত। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা শুধু ভৌগোলিক সীমারেখা টানেনি, এটি ছিল একটি মুক্তি সংগ্রাম। পাকিস্তানি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে একটি গণআন্দোলন। মানুষ চেয়েছিল বাকস্বাধীনতা, গণতন্ত্র, আইনের শাসন এবং ন্যায়বিচার। কিন্তু দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতার পরপরই জনগণের সেই স্বপ্নে চিড় ধরে। ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রথমে গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিলেও ১৯৭৪-৭৫-এর মধ্যেই তা একনায়কত্বের পথে মোড় নেয়। শেখ মুজিব ১৯৭৫ সালে চারটি দলকে একীভূত করে গঠন করলেন একদলীয় শাসনব্যবস্থা 'বাকশাল'। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বাতিল করা হয়, বিরোধী দল নিষিদ্ধ হয়। এই

সময়েই শুরু হয় রাজনৈতিক নিপীড়ন গুপ্তহত্যা

বাকস্বাধীনতা হরণ —এই সবই ঘটেছে "গণতন্ত্র" বজায় রাখার নামে। দিনের ভোট রাতে, বিচার ব্যবস্থায় পক্ষপাত, মন্ত্রীদের জবাবদিহিহীনতা —এ সবই সেই পুরনো একনায়কতন্ত্রের ছায়া মাত্র। শুধু নাম বদলেছে —আগে ছিলেন শেখ মুজিব, এখন শেখ হাসিনা। কিন্তু শাসনের রূপ বদলায়নি। আসলে এটা কোনো ব্যক্তির দোষ নয় একা, এটি একটি ধারা, একটি শাসন সংস্কৃতি। ক্ষমতার চেয়ার, রাষ্ট্রীয় সম্পদ, ব সআর গদি রক্ষার রাজনীতি —এসব মিলিয়ে এক ভয়াবহ চর সৃষ্টি হয়েছে। জনগণের রক্তে অর্জিত স্বাধীনতা এ পরিণত হয়েছে দলীয় দাসত্বে। শাসনব্যবস্থার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় তেজগাঁওয়ে অবস্থিত র্যাব সদর দফতরের ভেতরের berüchtigt (কুখ্যাত) "আয়না ঘর"। এটি ছিল এমন একটি নির্যাতনকক্ষ, যেখানে সন্দেহভাজনদের —প্রকৃতপক্ষে সরকারবিরোধী কণ্ঠকে —চোখ বাঁধা অবস্থায় দিনের পর দিন আটকে রাখা হতো। কেউ জানতো না তারা কোথায়, তাদের পরিবারের কাছে তাদের কোনো অস্তিত্বই থাকতো না। গুমের শিকার বহু মানুষ এখানে দিনের পর দিন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতো। হাত-পা বাঁধা অবস্থায়, খাদ্য ও চিকিৎসা বঞ্চিত হয়ে, রাষ্ট্রীয় ‘নিরাপত্তা’র নামে নিপীড়নের নিশ্ছিদ্র দেয়ালে ঠেকে তারা হারিয়ে যেত। এই ঘরে কোনো আয়না ছিল না, ছিল শুধু প্রতিচ্ছায়াহীন ভয়। এই আয়না ঘর ছিল এমন এক প্রতীক, যেখানে জনগণের প্রতিফলন ধ্বংস করে কেবল শাসকের মুখই দেখা যেত। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের যে ছায়ামূর্তি সেখানে দণ্ডায়মান ছিল, তা ছিল স্বাধীন দেশের গোপন গুলাগ। আজ ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায়, ১৯৭১ সালে যেসব অধিকার আদায়ের জন্য যুদ্ধ হয়েছিল —সেগুলো এখনো অধরা। গণমাধ্যম আজও ভয়ভীতির মুখে, ছাত্ররা দলবাজিতে বিভক্ত, শ্রমিকরা নিপীড়িত, গ্রামবাংলার মানুষ এখনো বিদ্যুৎ, পানির অভাবে কষ্ট করে। উন্নয়নের নামে শুধু বিলবোর্ড —কিন্তু ন্যায়বিচার ও মানবিক রাষ্ট্র গঠনের যে স্বপ্ন ছিল, তা এখনো ম্লান। তবে

বাংলাদেশের ইতিহাসে আলেম সমাজের ভূমিকা সবসময় ছিল জনমানুষের ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক চেতনাকে জাগিয়ে তোলা। তারা রাষ্ট্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, মানুষের ন্যায্য অধিকারের পক্ষে সোচ্চার থেকেছেন এবং জনগণের চেতনায় ইসলামি মূল্যবোধ রোপণ করেছেন। কিন্তু শেখ হাসিনার দীর্ঘকালীন শাসনামলে এই আলেম সমাজের ওপর যে ধরনের রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, গুম, অপমান ও নির্যাতন চালানো হয়েছে, তা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ইতিহাসে অশ্রাব্য ও কলঙ্কময় অধ্যায় হয়ে থাকবে। এই নিপীড়নের ইতিহাস কোনো কাল্পনিক অভিযোগ নয়, বরং বহু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, সংবাদপত্রের রিপোর্ট এবং ভুক্তভোগীদের জবানিতে তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। সরকার যখন নিজেদের কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়ে, তখনই শুরু হয় ধর্মীয় নেতাদের নানাভাবে দমন করার প্রচেষ্টা। তাদের কাউকে রাজনৈতিক হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, কাউকে ‘উগ্রপন্থী’ বা ‘জঙ্গি’ অপবাদে অভিযুক্ত করা হয়, আবার কাউকে চরিত্র হননের ষড়যন্ত্রে ফাঁসানো হয়। এসব করা হয়েছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে, ক্ষমতার মসনদ রক্ষার জন্য। আল্লামা আজিজুল হক রহ. ছিলেন দেশের একজন খ্যাতিমান ইসলামি চিন্তাবিদ, আপসহীন ধর্মপ্রাণ নেতা এবং সাহসী বক্তা এবং বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম বুখারী শরীফের অনুবাদক। তিনি রাজনীতিতে সরাসরি অংশ না নিয়েও ইসলামের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন, যা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর জন্য ছিল অস্বস্তিকর। একপর্যায়ে তাকে গ্রেফতার করে দীর্ঘ সময় কারাবন্দি রাখা হয়। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা, অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও তাকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। তাকে এমনভাবে দমন করা হয়েছিল, যেন তিনি কোনো অপরাধী। অথচ তিনি ছিলেন এমন একজন আলেম, যিনি দারুল উলুম দেওবন্দের চিন্তাধারায় বেড়ে ওঠা একজন সমাজসংস্কারক। তার সঙ্গে আচরণ ছিল রাষ্ট্রের

সমাজকে হেয় করার জন্য যে অপমানজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়, তা ছিল পরিকল্পিত। এরপর তাকে গ্রেফতার করে একের পর এক সাজানো মামলা দেওয়া হয়। রাজপথে দাপটের সাথে কথা বলার মানুষটিকে বছরের পর বছর ধরে নির্যাতন সহ্য করতে হয়। আদালতের নিরবতা, রাষ্ট্রের ন্যায্যতার অভাব, এবং জনগণের প্রতিবাদ ব্যর্থ হয়ে যায় একটি সুপরিকল্পিত দমননীতির কাছে।

এই চিত্র শুধু নির্দিষ্ট কিছু আলেম বা সংগঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং পুরো ইসলামী আন্দোলনের ওপরই চালানো হয় এক ভয়ংকর দমনযজ্ঞ। এর জ্বলন্ত প্রমাণ হলো জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের ওপর পরিচালিত পরিকল্পিত হত্যা ও বিচারবহির্ভূত রাজনীতি। আল্লামা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী ছিলেন ইসলামী রাজনীতির অন্যতম আলোকবর্তিকা, একজন শক্তিশালী চিন্তাবিদ ও জনপ্রিয় খতিব। তাকে যুদ্ধাপরাধের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়, যদিও তার বিরুদ্ধে যেসব সাক্ষ্য ও প্রমাণ উপস্থাপন করা হয় তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলও প্রশ্ন তোলে। তাকে প্রথমে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, পরে জনরোষ ও রাজনৈতিক কৌশলে তা আমৃত্যু কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়। কারাগারে দীর্ঘদিন শারীরিক ও মানসিকভাবে নিপীড়নের শিকার হয়ে অবশেষে তাকে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়।এটি ছিল একেবারে নগ্নভাবে রাষ্ট্রীয় হত্যার দৃষ্টান্ত।

তাকে যে পরিকল্পিতভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, তা ইতিহাসে অন্যায়ের আরেকটি জ্বলন্ত অধ্যায় হয়ে থাকবে। শুধু সাঈদী সাহেবই নন, জামাতের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের একের পর এক বিচার ও ফাঁসি দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামী চিন্তাধারাকে নিঃশেষ করে দেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়েছে। মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, কাদের মোল্লা, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মতো ব্যক্তিত্বদের এমনভাবে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে, যেভাবে বিজয় নয় বরং প্রতিহিংসার রাজনীতি রক্তাক্ত দাঁত বের করে হেসেছে। আন্তর্জাতিক

যারা হাদিসের ব্যাখ্যা দিতেন, তারা আজ সন্ত্রাস দমন আইনে অভিযুক্ত। যারা মানুষকে জুমার দিনে তাকওয়া শিখাতেন, তারা আজ কারাগারে নামাজ আদায় করেন হাতকড়াসহ। আর এই রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে থাকে নির্বিকার, শাসক বসে থাকে আয়নার ঘরে —যেখানে শুধু নিজের প্রতিচ্ছবিই দেখা যায়, জনগণের আহাজারি নয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই অধ্যায় একদিন পাঠ্যপুস্তকে লেখা হবে ‘আলেম নিধনের যুগ’ হিসেবে। যারা শুধু ধর্ম নয়, নৈতিকতা ও প্রতিবাদের চেতনাও বহন করতেন—তাদের মুখ বন্ধ করতে রাষ্ট্র যেভাবে তাণ্ডব চালিয়েছে, তা ইতিহাসের পাতায় রক্তে লেখা থাকবে।

এই অন্যায় ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সুনামি হয়তো এখনো ওঠেনি, কিন্তু জমে আছে নীরব মানুষের বুকের ভিতর। একদিন সময় বদলাবে, প্রতিটি জুলুমের হিসাব খোলা হবে। আল্লামা আজিজুল হক, জুনাইদ বাবুনগরী, মামুনুল হক, দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী —এরা শুধু নাম নয়, রাষ্ট্রীয় দমননীতির বিরুদ্ধে জীবন্ত দলিল। তারা হয়তো বন্দি ছিলেন, অপমানিত ছিলেন, কিন্তু পরাজিত ছিলেন না। তাঁদের জবান নিঃশেষ হয়নি, বরং সময়ের সাথে সাথে তা গর্জে উঠবে। আর সেই দিন, হয়তো দূর নয়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দলীয় রাজনীতি একসময় ছিল দেশ গঠনের চালিকাশক্তি, কিন্তু কালের প্রবাহে তা রূপ নিয়েছে প্রতিহিংসার এক বিষাক্ত সংস্কৃতিতে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে জাতি স্বপ্ন দেখেছিল এক ঐক্যবদ্ধ, উন্নয়নমুখী ও দায়িত্বশীল নেতৃত্বের। কিন্তু, বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। স্বাধীনতার পরপরই শুরু হয় ক্ষমতা দখলের লড়াই, একদল অপরকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে —আর সেখানেই জন্ম নেয় দলীয় বিভক্তি ও বিদ্বেষের বীজ। ১৯৭৫ সালে মজিব হত্যাকাণ্ডের পর রাজনৈতিক স্থিতি ভেঙে পড়ে। সেনা-সমর্থিত শাসন আসে, আর দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ ও শত্রুতা গভীর হয়। যারা একসময় একসাথে দেশ স্বাধীন করেছে, তারা পরিণত হয় পরস্পরের ঘোর শত্রুতে। প্রতিটি শাসকের সময়েই বিরোধী দলকে অপমান, অপদস্থ ও দমন করার ঘটনা ঘটেছে। মতের পার্থক্যকে সম্মান না করে তাকে শত্রুতার রূপ দেওয়া হয়েছে। ১৯৯১ সালের পর থেকে পালাবদলের রাজনীতি আরও সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে। এক দল ক্ষমতায় থাকলে অন্য দলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই দায় হয়ে পড়ে। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। মামলা, হামলা গ্রেপ্তার হুলিয়া লাঠিচার্জ—এসব হয়ে

বুদ্ধিজীবীরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিচারব্যবস্থা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পর্যন্ত দলীয় প্রভাবের বাইরে থাকতে পারে না। যেখানে একদল শাসন করে, অন্য দল সেখানে শ্বাস নিতে পারে না—এই অবস্থা কোনো দেশের জন্য আশীর্বাদ হতে পারে না। মতের ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ভিন্নতাকে দমন করে রাষ্ট্র পরিচালনা কখনোই সুস্থতার লক্ষণ নয়। রাজনীতি হয়ে পড়ে ঘৃণা, অপমান ও প্রতিশোধের কারখানা। জনসাধারণের চাওয়া, চাহিদা, অধিকার সবই হারিয়ে যায় এই সংঘাতের কোলাহলে। আজ বাংলাদেশের রাজনীতি এমন এক দুঃসময়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে প্রশ্ন করা যায় না, ভিন্নমত প্রকাশ করা যায় না, যেখানে বিরোধী রাজনীতিক মানেই অপরাধী কিংবা দেশবিরোধী শক্তি। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশপ্রেমিক মানুষ, যারা রাজনীতির মূল ভিত্তি হিসেবে দেশ ও জনগণের কল্যাণকে দেখতে চায়। দেশের প্রয়োজন এখন শান্তিপূর্ণ, ভদ্রতা ও সহনশীলতায় ভরপুর রাজনৈতিক পরিবেশ। প্রয়োজন এমন একটি ধারা যেখানে দল নয়, মত, যুক্তি, আলোচনা ও দেশের স্বার্থ গুরুত্ব পাবে। কিন্তু সেই পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে আগে দলীয় প্রতিহিংসার ও সংস্কৃতি ভাঙতে হবে। এই দেয়াল যতদিন থাকবে, ততদিন দেশের ভবিষ্যৎ থাকবে অনিশ্চয়তার ধোঁয়াশায় ঢাকা।

দুর্নীতির প্রক্রিয়া ও ধরণ — বাংলাদেশে দুর্নীতি আজ একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে, যেখানে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে প্রশাসনের সব স্তরে একটি অসাধু নেটওয়ার্ক সক্রিয়ভাবে কাজ করে। এটি শুধু বিচ্ছিন্ন কিছু ব্যক্তির লোভের বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং এটি একটি কাঠামোবদ্ধ ব্যবস্থা, যেখানে প্রতিটি স্তরে ভাগাভাগির নীতি, প্রভাব-প্রতিপত্তির ব্যবহার ও দায়মুক্তির নিশ্চয়তা রয়েছে। সরকারি নিয়োগ ও পদোন্নতিতে দলীয় আনুগত্য এবং আর্থিক লেনদেনকে মূল মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। যোগ্যতা ও দক্ষতা এখন দ্বিতীয় অবস্থানে। পুলিশ, প্রশাসন, শিক্ষকতা, এমনকি স্বাস্থ্য খাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরেও পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে "তদবির" বা "পার্সেন্টেজ" কথা ওঠে আগেই। বড় প্রকল্প ও উন্নয়ন কাজে দুর্নীতির প্রকৃতি আরও ভয়াবহ। আগে থেকেই বাজেট ফুলিয়ে-ফাপিয়ে তৈরি করা হয় যাতে "কমিশন" সুবিধা নিশ্চিত থাকে। টেন্ডার আহ্বানের নামে যে প্রক্রিয়া চলে তা যেন পূর্বনির্ধারিত নাটক। দলীয় পরিচয়ে ঠিকাদার

তফসিল করে আবার নতুন ঋণ অনুমোদন দেওয়া —এসব প্রক্রিয়া দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়েছে। কিছু চিহ্নিত গোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করছে, অথচ সাধারণ জনগণ তা ঠেকাতে ব্যর্থ, কারণ এই প্রক্রিয়াটি এতটাই প্রভাবশালী ও সুরক্ষিত। এছাড়া প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর একটি অংশ রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে কাজ করে। তাদের হাতে আইন প্রয়োগ নয়, বরং ‘পক্ষ নেওয়া’ হয়ে দাঁড়ায় মূল দায়িত্ব। প্রতিপক্ষকে দমন করতে তারা ব্যবহৃত হয়, আর নিজেদের দলীয় লোকদের রক্ষা করতে তারা হয়ে ওঠে ঢাল। এইভাবে রাজনীতির ছত্রছায়ায় একটি সমান্তরাল দুর্নীতির সরকার গড়ে উঠেছে —যার শিকড় সাধারণ জনগণের ভোগান্তিতে, এবং ডালপালা শাসকগোষ্ঠীর বিলাসে। এটি শুধুই অর্থনৈতিক ক্ষতি নয় —এটি একটি জাতির নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক অধঃপতন। এই সংস্কৃতি ভেঙে না দিলে দেশের ভবিষ্যৎ প্রতিদিনই অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে, আর দুর্নীতিই হয়ে উঠবে শাসনের নতুন স্বাভাবিকতা।

ইতিহাসের আলোকে দুর্নীতি: বাংলাদেশের ইতিহাসে দুর্নীতি এক নিষ্ঠুর বাস্তবতা, যা স্বাধীনতার পূর্বপ্রেক্ষাপটেও দেখা গিয়েছিল, কিন্তু স্বাধীনতার পরে তা রাষ্ট্রের শিরায়-শিরায় ছড়িয়ে পড়ে। এ দেশের দুর্নীতির ইতিহাস শুধুই ব্যক্তিগত লোভের নয়—এটি একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি, যেখানে ক্ষমতা ও পদকে ব্যবহার করা হয় ব্যক্তিস্বার্থ, দলীয় সুবিধা ও গোষ্ঠীগত প্রভাব প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে। স্বাধীনতার পর দেশ গঠনের চ্যালেঞ্জের সঙ্গে যুক্ত হয় প্রশাসনিক দুর্নীতি। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন, সাহায্য ও ত্রাণ বণ্টনের ক্ষেত্রে যথাযথ নজরদারির অভাব এবং দায়িত্বহীনতা প্রশাসনিক দুর্নীতির জন্ম দেয়। সরকারি গুদাম থেকে চাল, কাপড়, ওষুধ চুরি হওয়া, ত্রাণসামগ্রী কালোবাজারে বিক্রি হওয়া তখনকার দুঃখজনক চিত্র। এই সময় থেকেই

জনপ্রশাসন , পুলিশ , ভূমি অফিস , স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে ঘুষ ছাড়া কাজ হয় না বললেই চলে। বড় প্রকল্পগুলোতে বাজেট বাড়িয়ে কমিশন আদায় , দরপত্রে অনিয়ম, কাগজে কাজ দেখিয়ে বিল উত্তোলন —এসব আজ ওপেন সিক্রেট। রাজনীতিকেরা নিজেদের স্বার্থে পছন্দের ঠিকাদার , আমলা ও কর্মকর্তাদের ব্যবহার করেন এবং এর মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে রিজার্ভ চুরি , হলমার্ক , বিসমিল্লাহ , এবং শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি —এসব কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় , বরং দুর্নীতির সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। এসব ঘটনার পেছনে ছিল রাজনৈতিক প্রভাব , প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং বিচারহীনতা। ব্যাংকিং খাতে ঋণখেলাপিরা কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় , কিন্তু আইনি প্রতিকার হয় না। যারা দায়ী , তারা রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় নিরাপদ থাকে। এছাড়াও উচ্চপর্যায়ের মন্ত্রীরা বিদেশে বাড়ি , ব্যাংক অ্যাকাউন্ট , ব্যবসা স্থাপন করেছেন —যার অধিকাংশ সম্পদ ঘোষিত আয় -উৎসের বাইরে। প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারাও আজ বিলাসবহুল জীবনযাপন করছেন, যা একজন সরকারি কর্মচারীর বৈধ আয়ের সঙ্গে যায় না। দুর্নীতির এই নীরব দানবকে যারা লালন -পালন করছে, তারা আজ সমাজের প্রভাবশালী , সম্মানিত ও ক্ষমতাবান শ্রেণি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবতা জাতির জন্য শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ নয় , এটি মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়। মেধা নয় , তদবির ; সততা নয়, সুবিধা ;দক্ষতা নয় , দলীয় আনুগত্য —এসবই হয়ে উঠেছে প্রগতির মানদণ্ড। নতুন প্রজন্ম দেখে , সৎ পথে এগোলে হয়রানি , কিন্তু চাটুকারিতা আর দুর্নীতির পথেই সফলতা। ফলে সমাজে জন্ম নিচ্ছে হতাশা , অবিশ্বাস ও দ্বিচারিতা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি এখন একটি ক্যান্সারে রূপ নিয়েছে , যা শুধু অর্থনীতি নয় —দেশের নৈতিক ভিত্তিকে ধ্বংস করছে। এই ক্যান্সার প্রতিরোধে কেবল আইন নয়, প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা , জনগণের

চাঁদাবাজি এখন আর একটি বিচ্ছিন্ন অপরাধ নয়, এটি হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় লালিত এক ভয়াবহ ক্ষমতার সংস্কৃতি। যে দল ক্ষমতায় থাকে, তার আশ্রয়ে চলে চাঁদাবাজির সাম্রাজ্য; আর বিরোধী দল তখন প্রতিবাদের নামে নাটক করে। কিন্তু চাকা ঘুরলেই দৃশ্যপট পাল্টায়—তারা নিজেরাই হয়ে ওঠে আগের চেয়েও ভয়ংকর। এই দ্বিচারিতা এখন আমাদের রাজনীতির মূল চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজধানী থেকে মফস্বল—কোথাও নিরাপদ নয় সাধারণ ব্যবসায়ী বা নাগরিক। চাঁদা না দিলে তার পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। এবং সেই ভয়াবহতার সর্বশেষ উদাহরণ রাজধানীর মিটফোর্ডে ঘটে যাওয়া নির্মম হত্যাকাণ্ড। ৯জুলাই ২০২৫, পুরান ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে পাথর-পুতা ফুটপাথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভাঙারি ব্যবসায়ী মো. সোহাগ (যিনি 'লাল চাঁদ' নামে পরিচিত ছিলেন) চাঁদা দিতে অস্বীকার করেন। প্রতিশোধ নিতে যুবদল নেতারা প্রথমে তাকে পিটিয়ে অর্ধমৃত করেন, তারপর ইট-পাথর দিয়ে মাথা থেঁতলে খুন করেন। সর্বশেষ নগ্ন করে লাশ ফেলে রাখা হয়, যেন তা হয় এক শিক্ষা—"চাঁদা না দিলে জীবনও শেষ"। এই নির্মমতা শুধু হত্যাই নয়, তা ছিল একটি প্রকাশ্য বার্তা: “আমরা যা চাই, সেটাই আইন”। কিন্তু এই ঘটনা ব্যতিক্রম নয়। বরং এর ধারাবাহিকতা ছড়িয়ে আছে সারা দেশেই। নাটোরে এক ব্যবসায়ীর কিশোর কর্মচারী ফয়সালকে চাঁদা না দেওয়ায় ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতারা ধরে নিয়ে যায়। পরে প্লায়ার দিয়ে হাতের নখ উপড়ে ফেলা হয়। নির্যাতনের এই বর্বরতা শত শত মানুষের সামনে ঘটলেও প্রশাসন চুপ ছিল।

যশোরের শার্শায় এক সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও তার পরিবার চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে রাতের আঁধারে সন্ত্রাসীরা তাদের বাড়িতে হামলা চালায়। প্রাণে রক্ষা পেলেও ভয় পেয়ে এলাকা ছেড়ে পালাতে

হয় পুরো পরিবারকে □ আরও বহু ঘটনা ঘটে যাচ্ছে

এই সময়ের প্রয়োজন নতুন প্রতিবাদ , দায়িত্বশীল রাজনৈতিক সংস্কৃতি , প্রশাসনিক জবাবদিহিতা এবং জনগণের ভয়কে সাহসে রূপান্তরের সাহসী পদক্ষেপ। নয়তো একদিন এই চাঁদার রাজত্বে নিঃশেষ হয়ে যাবে বিবেক , মানবতা ও রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব —সব।

উপসংহার : চাঁদাবাজি এখন একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রূপ নিয়েছে , যেখানে প্রতিবাদ মানেই মৃত্যু ডেকে আনা। মিটফোর্ডে সোহাগের নির্মম হত্যাকাণ্ডসহ আরও বহু ঘটনা প্রমাণ করে , রাষ্ট্র নীরব আর অপরাধীরা বেপরোয়া। এই চক্র ভাঙতে হলে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা , প্রশাসনের জবাবদিহি এবং জনগণের সাহসী প্রতিবাদ। নইলে একদিন এই চাঁদার রাজত্বেই বিলীন হবে ন্যায় , মানবতা ও নিরাপত্তা।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দুর্নীতির সবচেয়ে ভয়াবহ ও সূক্ষ্ম রূপ হলো ক্ষমতাসীন মন্ত্রীদের বিদেশে অবৈধ সম্পদ গড়ে তোলা যার বেশির ভাগই গোপনে সংগঠিত হয়েছে স্ত্রী সন্তান ও আত্মীয়স্বজনের নামে। এই দুর্নীতির চক্র এখন এতটাই সুসংগঠিত ও বিস্তৃত যে তা রাষ্ট্রের সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পৌঁছে গেছে। এসব সম্পদের উৎস কোথাও পরিষ্কার নয় , আবার কোথাও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রকল্প ,ঘুষ ও কমিশনের মাধ্যমে অর্জিত। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ও তার স্ত্রী আরিফা জেসমিনের বিরুদ্ধে রয়েছে বিপুল পরিমাণ অস্বাভাবিক সম্পদের অভিযোগ। ২০০৮ সালে পলকের ঘোষিত আয় ছিল মাত্র ৫ লক্ষ টাকা। অথচ ২০২৩ সালের মধ্যে তার ও স্ত্রীর যৌথ সম্পদ বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০ কোটির বেশি। স্ত্রীর নামে ব্যাংকে লেনদেন হয়েছে ২২ কোটির বেশি , আর পলকের নামে ৩২ কোটিরও বেশি। অভিযোগ রয়েছে , এই সম্পদের উৎস অস্বচ্ছ এবং তা মূলত রাজনীতি , ঠিকাদারি এবং প্রযুক্তি খাতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অপব্যবহার থেকে এসেছে। সাবেক স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মো . তাজুল ইসলাম ও তার স্ত্রী ফৌজিয়া ইসলামের নামে রয়েছে ৪৬টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১৩৯ কোটির বেশি টাকার লেনদেন। এই বিপুল অর্থের উৎস সম্পর্কে কোনো বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে যে এই অর্থের

একইভাবে ভূমি মন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ ও তার স্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বিপুল লেনদেনের তথ্য উঠে এসেছে , যার মূল উৎস হলো জমি রেজিস্ট্রি , দলিল অনুমোদন, এবং প্রকল্প কমিশনের ঘুষ। অন্যদিকে , কানাডার টরন্টোতে গড়ে উঠেছে “বেগমপাড়া ” নামে একটি আলোচিত বসতি, যেখানে বাংলাদেশের মন্ত্রী , এমপি ও আমলাদের স্ত্রীরা পরিবার নিয়ে থাকেন। তারা অনেকেই সরকারি দায়িত্বে থাকা অবস্থায় পরিবারকে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং সেখানে বিলাসবহুল ফ্ল্যাট , ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করেছেন।
এইসব অর্থ বাংলাদেশের বাইরে নেওয়ার প্রক্রিয়া ছিল জটিল ও চতুর —কখনও বৈদেশিক ভ্রমণ ব্যয়ের নামে , কখনও এনজিও কিংবা আইটি সার্ভিস রপ্তানির আড়ালে।
এই চিত্র কেবল মন্ত্রী পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়।
প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারাও দুর্নীতির এই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে নেই। পুলিশের মহাপরিদর্শক , অতিরিক্ত আইজি , ডিআইজি পর্যায়ের অনেক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রয়েছে কোটি কোটি টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ। তাদের কেউ কেউ ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে জমি দখল , চাঁদাবাজি , নিয়োগ বাণিজ্য ও প্রকল্প ঘুষে জড়িত হয়েছেন। ঢাকার অভিজাত এলাকাগুলোতে একাধিক বাড়ি , প্লট , গাড়ি —এমনকি বিদেশে সন্তানদের বিলাসবহুল পড়ালেখার খরচ —সবই এই অবৈধ সম্পদের ইঙ্গিত দেয়। বিশেষ করে পুলিশের বিভিন্ন পদে নিয়োগ , বদলি এবং ট্রেনিংয়ে ঘুষের রেট নির্ধারিত থাকে। যারা প্রশাসনের উপরে , তারা এই প্রক্রিয়া তদারকি করেন এবং বিনিময়ে “ভাগ” পান।
শুধু পুলিশ নয় —জনপ্রশাসন , ভূমি , কর বিভাগ , পাসপোর্ট অফিস , শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় — প্রত্যেক খাতেই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অদৃশ্য লেনদেনের অংশীদার। একসময় যে “চা -খরচ” ছিল, আজ তা পরিণত হয়েছে “পারসেন্টেজ নীতি ”-তে। একজন ইউএনও বা ডিসি যখন একটি প্রকল্পে কোটি টাকা ছাড় দেন , তখন তার ভাগ কোথায় যায় , তা অনেকেই জানেন , কেউ বলেন না।
বাংলাদেশ ব্যাংক , জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), এলজিইডি শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরএসব

স্বাধীন রাষ্ট্রে নাগরিকের স্বাধীনতা সবচেয়ে বড় অধিকার। কিন্তু যখন এই স্বাধীনতা একদল মানুষের জন্য বরাদ্দ থাকে, আর বাকিদের জন্য তৈরি হয় শাসনের কাঁটা তার, তখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হয়ে ওঠে নিপীড়নের অস্ত্র। বাংলাদেশে বিগত দুই দশকে রাষ্ট্রশক্তি যেন ধীরে ধীরে জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক মতপ্রকাশ, মানবিক প্রতিবাদ, এমনকি মৌলিক অধিকারের দাবিতেও যখন সাধারণ মানুষকে মুখ থুবড়ে পড়তে হয়, তখন স্পষ্ট হয়—এই রাষ্ট্র আর মানুষের নয়, বরং ক্ষমতাসীনদের একচ্ছত্র শাসনের প্রতীক। অভিযোগহীন গ্রেপ্তার, প্রহসনের মামলা, বছরের পর বছর বিচারবিহীন বন্দিত্ব—এসব যেন নিত্যদিনের চিত্র। একদিকে ক্ষমতার স্বার্থে বিরোধী দল কিংবা ভিন্নমতের মানুষদের দমন করা হচ্ছে, অন্যদিকে এ সুযোগে রাজনীতির ছায়ায় বেড়ে উঠছে পুলিশি রাষ্ট্রের প্রতাপ। আজ কেউ যদি দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে, সে রাষ্ট্রদ্রোহী; কেউ যদি বঞ্চনার বিরুদ্ধে পথে নামে, সে অস্থিরতা সৃষ্টি করে; কেউ যদি কেবল সামাজিক মাধ্যমে নিজের মত প্রকাশ করে, তাতেও তাকে ভয় দেখানো হয়—মামলা, গ্রেপ্তার কিংবা গুমের হুমকি দিয়ে। এক সময় যেসব কাজ ছিল একমাত্র স্বৈরাচারদের, আজ তা গণতন্ত্রের মুখোশ পরা সরকারও করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এই অন্যায় বন্দিত্বের সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হলো—এতে কেবল রাজনীতি নয়, সাধারণ নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তা ও মর্যাদা বিপন্ন হয়। বাবা হারায় সন্তান, স্ত্রী হারায় স্বামী, ঘর হারায় আশ্রয়। অথচ তাদের অপরাধ কিছুই নয়—কেবল সত্য বলা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই তা ন্যায্য হতে পারে না। বরং এটি স্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন, যা আন্তর্জাতিক নীতিমালার পরিপন্থী এবং একটি সভ্য সমাজের আদর্শের পরিপূরক নয়। অন্যদিকে, রাষ্ট্র এই বন্দিত্বকে আইন ও নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে বৈধতা

সেখানে আজ ভয়ের সংস্কৃতি গড়ে তুলে সেই ঐক্যকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে। রাষ্ট্র যদি নিজেই আইনের শাসনকে পদদলিত করে, বিরোধীদের কণ্ঠরোধে ব্যস্ত থাকে, এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে দাসত্বেপরিণত করে —তাহলে সেই রাষ্ট্র আর একটি গণতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি নয়। বরং তা একটি ভয় ও নিপীড়নের সমাজ, যেখানে ক্ষমতা বাঁচিয়ে রাখতেই মানুষকে বন্দি করা হয়, হত্যা করা হয়, নিখোঁজ করা হয়। এই বাস্তবতা আমাদের কেবল ব্যথিতই করে না, সতর্কও করে। কারণ আজ যারা বন্দি, তারা কাল আমরা হতে পারি। আজ যারা নিখোঁজ, তারা হয়তো আগামী প্রজন্মের স্বপ্ন ছিল। রাষ্ট্র যদি তার নাগরিকদের ভালবাসতে না শেখে, বরং ভয় পেতে শেখে — তাহলে সেই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ শূন্য, এবং সেই ভবিষ্যতের কোনো মূল্য ইতিহাস রাখে না।

বাংলাদ েশের □□□□□□□ □□ □□□র □ কষ্টকর অধ্যায় হলো সেই সময়কাল, যখন ধর্মীয় শিক্ষার্থীদের ওপর সন্দেহ, দমন ও অপবাদের কালো ছায়া নেমে এসেছিল। বিশেষত কওমি মাদ্রাসার ছাত্রদের "জঙ্গি সন্দেহে" বারবার গ্রেপ্তার এবং তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় মেশিনারির নির্লজ্জ ব্যবহার জাতি হিসেবে আমাদের প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। কেউ কুরআন শিখছে, কেউ হাদীস মুখস্থ করছে, কেউ সেজদায় যাচ্ছে —আর সেই অপরাধেই তারা হয়ে উঠেছে সন্দেহভাজন? এই অন্ধ দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম কেবল দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নয়, বরং এক বৃহৎ আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ছায়াতেও লুকিয়ে আছে, যার নেপথ্য কুশীলব ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW। ২০১৫ সাল থেকে শুরু করে ২০২২ পর্যন্ত একের পর এক ঘটনা ঘটেছে, যেখানে সংবাদপত্রে নিয়মিত খবর আসতো—"জঙ্গি সন্দেহে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক গ্রেপ্তার", "জঙ্গি সন্দেহে ঢাবি ছাত্র রিমান্ডে", "নামাজ পড়ার সময় ছাত্রকে হয়রানি"। এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং এগুলো একটি সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় কৌশলের অংশ, যার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় চেতনার উত্থান রোধ করা এবং ইসলামী মূল্যবোধ-ভিত্তিক সমাজ গঠনের পথ আটকে দেয়া। রিমান্ড থেকে ফিরে আসা অনেক শিক্ষার্থী জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদকারী কর্মকর্তারা হিন্দি ভাষায় কথা বলতেন। তারা ভয় দেখাত, অপমান করত, এবং কখনো কখনো এমন প্রশ্ন করত যেগুলো দেশের বাহিনীর

যেতে পারে। বিশেষ করে কওমি মাদ্রাসাগুলো ইসলামি সমাজচেতনার প্রাণকেন্দ্র, যেখানে ভারতবিরোধী জাতীয়তাবোধ ও উম্মাহভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হয়। তাই RAW চায় এই শিক্ষাব্যবস্থাকে দুর্বল করতে, বদনাম দিতে এবং জনমানসে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিতে। অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ধর্মীয় আচরণ যেন অপরাধে পরিণত হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে হিজাব-নিকাব পরা ছাত্রীদের বাধা দেওয়া হয়েছে, নামাজ পড়া ছাত্রদের "শিবির", "জঙ্গি" আখ্যা দিয়ে মানসিক নিপীড়ন চালানো হয়েছে। ২০১৯ সালে "দ্য ঢাকা পোস্ট" এবং "প্রজন্ম ২৪" এর প্রতিবেদনে দেখা যায়, একাধিক ছাত্রীকে হিজাব খুলে ফেলার জন্য হুমকি দেয়া হয়, যা ধর্মীয় স্বাধীনতার চরম লঙ্ঘন। এসব ঘটনা শুধু ব্যক্তি অধিকার নয়, একটি জাতির ধর্মীয় মূল্যবোধকেই অসম্মান করার অপচেষ্টা।

ভারত এসব ঘটনাকে কৌশলে পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রয়োজনে উৎসাহ দেয়, কারণ তাদের লক্ষ্য কেবল রাজনৈতিক দখল নয়, সাংস্কৃতিক প্রভাবও বিস্তার করা। তারা চায় বাংলাদেশ হিন্দুত্ববাদী ভারতের প্রভাববলয়ে ঢুকে পড়ুক—চেতনায়, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে। এজন্য দেশের ভেতরে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করা তাদের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য। RAW-এর মাধ্যমে তারা এই অপারেশনকে বাস্তবায়ন করে। এই অবস্থা এক ভয়াবহ সত্যের দিকে ইঙ্গিত দেয়—আমরা হয়ত অজান্তেই আমাদের আত্মপরিচয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছি।

ধর্মীয় শিক্ষা, পর্দা, নামাজ—যা আমাদের মৌলিক অধিকার, তাই এখন হয়ে উঠছে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সন্দেহের বিষয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যদি দেখে মসজিদে গেলেই তাকে "চিনহিত" করে ফেলা হয়, যদি হাদীস মুখস্থ করার জন্য গোপনে পড়তে হয়—তবে তারা কীভাবে আত্মবিশ্বাসী, নীতিবান ও আলোকিত মানুষ হয়ে উঠবে?

তাই আজ প্রয়োজন—জাতিকে সতর্ক করা, রাষ্ট্রকে

রাষ্ট্র যখন মানুষের জন্য নয়, বরং কিছু গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার যন্ত্রে পরিণত হয়, তখন সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি অবহেলিত ও নির্যাতিত হয়। এই দেশ একদিন স্বপ্ন দেখেছিল স্বাধীনতার—যেখানে মানুষ নিজের মত বলবে, নিজের অধিকারে চলবে। কিন্তু সেই স্বপ্ন বহু আগেই দুঃস্বপ্নে রূপ নিয়েছে।

স্বাধীনতার পরপরই যে আশার আলো মানুষ দেখেছিল, তা দ্রুতই ম্লান হয়ে যায়। শাসকেরা চেয়েছিলেন একক নিয়ন্ত্রণ, সকল ভিন্ন কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, বিরোধী মতের নেতাদের গ্রেপ্তার, লেখক-সাংবাদিকদের নিপীড়ন—সবকিছু চলতে থাকে একে একে। রাষ্ট্র তখন আর জনগণের বন্ধু ছিল না, হয়ে উঠেছিল নিয়ন্ত্রণের লাঠিধারী। ১৯৭৫ সালে যেভাবে একদলীয় ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়, তা কোনো শত্রু রাষ্ট্র নয়—নিজের দেশের মানুষের কাছ থেকে তাদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার নির্মম অধ্যায়। সেই সময় দেশের বাতাস ভারী ছিল আতঙ্কে। কেউ কথা বললেই সন্দেহ, কেউ লিখলেই মামলা। এরপর যাঁরা শাসনক্ষমতায় এসেছেন, তাঁরাও ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরতেই রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করেছেন।

পুলিশের গুলি, অভিযান, বিচারহীন হত্যা, সন্ধ্যার পর ছাত্রনেতাদের গুম—এসব যেন নিত্যদিনের খবর হয়ে উঠেছিল। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক—যারা কেবল নিজের অধিকার চেয়েছিল, তাদের দেওয়া হয়েছে মৃত্যুদণ্ড, জেল, অপবাদ। মানুষ যখন রাষ্ট্রের ভয়ে চুপ হয়ে যায়, প্রতিবাদ না করে নিজেকে রক্ষা করাই বড় কাজ মনে করে, তখন বোঝা যায়—শাসন কতটা নির্মম হয়ে উঠেছে। এদেশে মানুষ নিজের সন্তান হারিয়ে কাঁদে, অথচ বিচার চায় না—কারণ বিচার চাওয়াটাই এখন 'অপরাধ'।

২০২৪ সালের আন্দোলন ছিল এমনই একটি ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ—যেখানে বৈষম্য আর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামে সাধারণ মানুষ। কিন্তু প্রতিদান ছিল গুলি, মৃত্যু আর গ্রেপ্তার। শহীদ

তাদের রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করতে দেননি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদও করতে বাধা দিয়েছেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যরাত পর্যন্ত প্রায় এক রাতব্যাপী চলা এই হত্যাকাণ্ডে বিডিআরের কিছু জওয়ান অস্ত্র হাতে নিয়ে তাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং নির্মমভাবে প্রায় ৫৭ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে হত্যা করে। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং রাতের অন্ধকারে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ড দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গভীর আঘাত হানে। সরকার বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলোচনার নামে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বিদ্রোহকে আরও উস্কে দেয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ঘটনার পর সাহসী ও দেশপ্রেমিক অনেক বিডিআর সদস্যকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয় এবং ‘আয়নাঘর’ নামে এক বন্দি কক্ষে তাদের আটকে রেখে নৃশংস নির্যাতন চালানো হয়। এই সময় আরও অনেক সদস্য নিখোঁজ হয়ে যান। সর্বশেষ বিডিআরের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি) রাখা হয়, যা দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় একটি নতুন অধ্যায় সূচনা করে। পিলখানা হত্যাকাণ্ড শুধু একটি সামরিক বিদ্রোহ ছিল না; এটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, দুর্নীতি ও বিদেশি হস্তক্ষেপের মিশ্রণ। এই দুঃখজনক ঘটনার জন্য দায়ী শুধু বিদ্রোহীরা নয়, বরং দায়িত্বহীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব, দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন এবং দেশের অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির পেছনে থাকা বিদেশি শক্তিরাও। এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশের সামরিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও দৃঢ় ও স্বচ্ছ করতে হবে, যেন জাতি আর কখনো এমন বিপর্যয়ের মুখোমুখি না হয়।

তথ্যসূত্র
[1234] দৈনিক যুগান্তর, “কারা-নির্যাতিত বিডিআর পরিবারের সংবাদ সম্মেলন প্রকাশ: ১৫ জানুয়ারি ২০২৫

“পিলখানা হত্যাযজ্ঞ: ইমামও রক্ষা পায়নি মানবতার কলঙ্কে”

২০০৯ সালের পিলখানার সেই রক্তস্নাত প্রভাত শুধু

২০১৩ সালের ৫ মে , ঢাকার শাপলা চত্বরে ইতিহাসের এক কলঙ্কিত রাত রচিত হয়। হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের ডাকে লক্ষাধিক ধর্মপ্রাণ মুসলমান রাজধানীতে জমায়েত হয়। তারা শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামবিরোধী ব্লগারদের শাস্তি , নারীনীতির সংস্কার এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষায় ১৩ দফা দাবি তুলে ধরে। এই আন্দোলনের মূল অংশ ছিল মাদ্রাসার ছাত্র , শিক্ষক ও সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষ। কিন্তু রাষ্ট্র তাদের আন্দোলনের জবাব দেয় বুলেট , লাঠি , নিপীড়ন ও মিথ্যাচারে। দিনভর উত্তেজনার পর রাতে রাষ্ট্র অপারেশন শুরু করে। বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়া হয় , মোবাইল নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন করে গোটা এলাকা অন্ধকারে ফেলে সেনা , , পুলিশ ও বিজিবি সদস্যরা ঘিরে ফেলে শাপলা চত্বর। শুরু হয় নির্মম অভিযান — গুলি , টিয়ার গ্যাস , জলকামান, লাঠিচার্জের ভয়াবহ সমন্বয়ে চত্বর রূপ নেয় এক মৃত্যুপুরীতে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বহু আন্দোলনকারী ঘটনাস্থলেই নিহত হন , আহতদের আর্তনাদ চাপা পড়ে রাষ্ট্রের বন্দুকের আওয়াজে। সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল পরবর্তী মুহূর্তগুলো। রাষ্ট্র আহতদের হাসপাতালে নিতে দেয়নি। পুলিশ হাসপাতালের পথ আটকে দেয় , অ্যাম্বুলেন্স আসতে বাধা দেয়। অনেকে গুরুতর আহত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকেন , কিন্তু পুলিশের ভয়ে চিকিৎসকরা পর্যন্ত তাদের ভর্তি করতে চাননি। মেডিকেল কর্তৃপক্ষ আহতদের ফিরিয়ে দেয় বা গোপনে চিকিৎসা করে —কারণ রাষ্ট্রের ভয় তাদের নিঃশ্বাস পর্যন্ত রুদ্ধ করে রেখেছিল।

শুধু তাই নয় , যারা শহীদ হয়েছেন বলে পরিবার দাবি করে, তাদের লাশ অনেক সময় জোরপূর্বক নিয়ে যাওয়া হয়। পরিবারকে জানানো হয়নি , কোথায় দাফন করা হয়েছে কেউ জানে না। কোথাও কোথাও পরিবার কবরস্থ করতে চাইলেও প্রশাসনিক বাধা ,ভয়ভীতি ও নজরদারির কারণে অনেকেই গোপনে দাফন করতে বাধ্য হয়। এইভাবে ধর্মপ্রাণ

মানবতা এবং গণতন্ত্র সবকিছুই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। এই রাতেই রাষ্ট্র বন্ধ করে দেয় ইসলামী চেতনায় পরিচালিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদমাধ্যম—ইসলামী টিভি ও দিগন্ত টিভি। কারণ, তারা সরাসরি সম্প্রচার করছিল কীভাবে সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রের হাতে আক্রান্ত হচ্ছিল। রাষ্ট্র চেয়েছিল সত্য না ছড়াক, দেশ-বিদেশে যেন কেউ না জানে কী হচ্ছে। চ্যানেল দুটি বন্ধ করে সরকার নিশ্চিত করেছিল—গণহত্যার কোনো দৃশ্য বাইরে না যায়, এবং ইতিহাসে কোনো প্রামাণ্য চিহ্ন না থাকে।

এই আন্দোলনে যারা শরিক হয়েছিলেন, তাঁদের পরিবারের ওপরও শুরু হয় দমন-পীড়ন। অনেকের পরিবারকে হয়রানির শিকার হতে হয়, ভয়ভীতি দেখানো হয়। গ্রেফতার, হয়রানি, বাড়িতে হানা—সবই ঘটে দিনের পর দিন। অনেক ছাত্র মাদ্রাসা থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়, অনেকে নিখোঁজ হয়। অনেকে আজও জানে না তার ভাই, ছেলে, বন্ধু কোথায়, বেঁচে আছে কি না। ২০১৩ সালের ৫ মে শুধু একটি আন্দোলন দমন নয়, এটি ছিল রাষ্ট্রের হাতে ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত অভিযান।

এটি একটি গোপন গণহত্যা, যার বিচার হয়নি, স্বীকৃতি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। শহীদের কোনো তালিকা নেই, তদন্ত হয়নি, দায়ীদের কেউ শাস্তি পায়নি। রাষ্ট্র এ ঘটনার চিহ্ন পর্যন্ত মুছে ফেলতে চেয়েছে। তবু ইতিহাস ভুলে না। শাপলা চত্বরের সেই রাত এক জাতির স্মৃতিতে রয়ে যাবে রক্তাক্ত দাগ হয়ে। যেখানে সত্য চাপা পড়েছে বন্দুকের নিচে, যেখানে রাষ্ট্র নিজের জনগণকে ভয় পেয়েছে, আর নিজের হাতেই হত্যা করেছে তাদের—শুধু একটি কারণে: তারা আল্লাহ, রাসূল এবং ইসলামের পক্ষে কথা বলেছিল।

<u>আহ্বানের মূল্য দিতে না পারা হেফাজত:</u> ২০১৩ সালের শাপলা চত্বরের রক্তাক্ত ঘটনার পর, যখন দেশজুড়ে শোক ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন আহত ও নিহতদের পরিবারগুলো অসহায় হয়ে পড়ে। সন্তানহারা মায়েরা, ভাইহারা বোনেরা, স্বামীহারা স্ত্রীদের কান্না কেউ শোনেনি—রাষ্ট্র তো নয়ই, হেফাজতে ইসলামের

যারা তাদের আহ্বানে এসেছিল, তারা ফিরে যায়নি, কিন্তু যারা আহ্বান করেছিল—তারা অনেকেই ফিরে গিয়েছিল চুপচাপ। ইতিহাস এই ভুলে যাওয়া নেতৃত্বকেও একদিন কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। কারণ শহীদের রক্ত চুপ করে থাকে না, চিরকাল।

২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক সাহসী প্রজন্মের নবজাগরণের অগ্নিস্নান। এটি ছিল এমন এক গর্জন, যেখানে শুধু কণ্ঠ ছিল না — ছিল হৃদয়ের রক্তক্ষরণ, স্বপ্নভঙ্গের দীর্ঘশ্বাস, এবং আত্মমর্যাদা রক্ষার শপথ। যখন শিক্ষার মন্দিরে মেধার চেয়ে পরিচয় মুখ্য হয়ে ওঠে, যখন একটি গোষ্ঠীর নামে হাজারো সম্ভাবনা নির্বাসিত হয় — তখনই জন্ম নেয় বিস্ফোরণ। সেই বিস্ফোরণ জেগে উঠেছিল তরুণ শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে। দেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা, প্রাইভেট ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার তরুণ-তরুণী উঠে দাঁড়িয়েছিল—এক বৈষম্যহীন, ন্যায্য এবং মেধাভিত্তিক সমাজ গড়ার দাবিতে।

আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ‘কোটা সংস্কার’। কোটা হলো সরকারি চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষের জন্য সংরক্ষিত আসন। এটি মূলত প্রান্তিক, পিছিয়ে পড়া ও বিশেষ শ্রেণির মানুষদের সুযোগ দেওয়ার জন্য চালু হয়েছিল। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য প্রথম কোটা চালু হয়।

২০১৮ সালের আগে সরকারি চাকরিতে মোট কোটা ছিল প্রায় ৫৬%

- মুক্তিযোদ্ধা পরিবার: ৩০%
- নারী: ১০%
- জেলা: ১০%

(জেলা কোটা হলো সরকারি চাকরি বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিটি জেলার জন্য নির্দিষ্ট শতাংশ আসন সংরক্ষণের একটি নীতি। বাংলাদেশে এর উদ্দেশ্য হলো পিছিয়ে থাকা ও গ্রামীণ এলাকার প্রার্থীদের সুযোগ দেওয়া যাতে সব

আন্দোলনের স্লোগান ছিল: "কোটা না, মেধা; মেধা মেধা!"
কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ ও যৌক্তিক আন্দোলনে পুলিশ ও ছাত্রলীগ শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করে। এমনকি একসময় এই আন্দোলন একটি রক্তাক্ত বাঁকে পৌঁছায় ১৬ জুলাই, যখন রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও সংগঠক আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে নির্মমভাবে নিহত হন। তার মৃত্যু শুধু একজন প্রাণহানিই ছিল না, বরং পুরো প্রজন্মের বুকভাঙা চিৎকার ছিল। আন্দোলনকারীরা তাকে ঘোষণা করে প্রথম শহীদ। এরপর আন্দোলন আর শুধু কোটা সংস্কারের সীমাবদ্ধ থাকে না; তা রূপ নেয় আত্মপরিচয় ও ন্যায়ের সর্বাত্মক লড়াইয়ে। শেখ হাসিনার সরকার — যিনি নিজে এককালের আন্দোলনকর্মী — এই নবপ্রজন্মের দাবিকে মেনে না নিয়ে বরং শুরু করেন নির্মম দমননীতি। শান্তিপূর্ণ মিছিলের মুখোমুখি হয় পুলিশি গুলি, ছাত্রলীগের হামলা এবং রাষ্ট্রীয় নির্যাতন। শেখ হাসিনা নিজে বলেছিল: "মুক্তিযোদ্ধার নাতি-পুতিরা মেধাবী না, তাহলে কি সব রাজাকারদের নাতি-পুতিরাই মেধাবী?"
এই বিতর্কিত বক্তব্যের জবাবে ছাত্রসমাজের মধ্যে গর্জে ওঠে এক প্রতিরোধ: "তুমি কে, আমি কে"
"রাজাকার, রাজাকার!"
"কে বলেছে, কে বলেছে — স্বৈরাচার, স্বৈরাচার"
"চেয়েছিলাম অধিকার — হয়ে গেলাম রাজাকার!"
তাদের মুখে আর শুধু কোটা সংস্কারের দাবি ছিল না; ছিল স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে রক্তে লেখা প্রত্যাখ্যান। এই আন্দোলন আরও রক্তপাতের সাক্ষী হয়। ১৮ জুলাই সাভারে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন শাইখ আসহাবুল ইয়ামিন, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের একজন উজ্জ্বল ছাত্র। তাঁর রক্তে সাভারের মাটি ভিজে ওঠে — যা প্রমাণ করে, এই লড়াই কেবল ভাষণের নয়, আত্মত্যাগের।
অন্যদিকে, মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ — এক তরুণ,

একটি দাবি নয় —এটি ছিল এক চেতনার নাম, অসম সাহসিকতার কাহিনি, এক প্রজন্মের আত্মমর্যাদার গর্জন। আবু সাঈদ, ইয়ামিন, মুগ্ধ —এদের রক্তে লেখা ইতিহাস আজ বলে যায়: “বাংলাদেশ কোনো পরিবার, কোনো গোষ্ঠী, কোনো রাজনীতিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় —এটি শহীদদের রক্তে গড়া একটি দেশ”

আগস্ট ২০২৪ — [illegible] র[illegible] [illegible] ইতিহাসের এক অশান্ত সকালের সুর। শহীদ মিনারের পাদদেশে সমবেত হাজারো কণ্ঠে উচ্চারিত হলো "এক দফা এক দাবি" “শেখ হাসিনার পদত্যাগ!” আর সেই স্লোগান মুহূর্তেই রূপ নেয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গে। ৬ আগস্টের ঘোষণা ছিল ‘পদযাত্রা’, কিন্তু ৪ আগস্টেই যখন রক্তে রঞ্জিত হলো রাজপথ, তখন আন্দোলনের ঢেউ থামার বদলে আরও বেগবান হলো —৫ আগস্টে রচিত হলো এক ঐতিহাসিক অধ্যায়: “ঢাকা অভিমুখে লং মার্চ”। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে, ঢাকার আকাশে উদিত হলো নতুন দিনের আর্তনাদ। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পতাকাতলে মাদ্রাসা ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ঢল, তাদের চোখে আগুন, হাতে ব্যানার, কণ্ঠে প্রতিবাদের বজ্রনিনাদ: “হাসিনা নিপাত যাক!” শহরের প্রাণকেন্দ্র —প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জাতীয় সংসদ ভবন, আর গণভবনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিক্ষোভের ঢেউ। পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল সাঁজোয়া বাহিনী, দাঙ্গা পুলিশ ও আধাসামরিক শক্তির শীতল, অমানবিক প্রাচীর।

১১টায় সেই প্রতিরোধ ভেঙে যায়। বিক্ষোভকারীরা অনুপ্রবেশ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গলিতে। গর্জে ওঠে গুলি, ছুটে বেড়ায় ধোঁয়া আর মৃত্যুর কান্না। দুপুরে খবর এলো: গণভবনের প্রবেশদ্বার দখলে। শেখ হাসিনাকে ইতোমধ্যেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, বলা হলো, "নিরাপদ আশ্রয়ে"।

রাতের ঘূর্ণিঝড়: ক্ষমতার ভেতরকার দ্বন্দ্ব: তবে এই সহিংসতা ও জনবিস্ফোরণের আগেই, ৪ আগস্ট রাত — রাজনীতির ইতিহাসে চিরকাল অন্ধকারময় এক পর্ব হয়ে থাকবে। রাত ১২টা পার হতেই, গণভবনে শুরু হয় আতঙ্কে আচ্ছন্ন এক বৈঠক। উপস্থিত সেনা, নৌ ও

ভোরের সিদ্ধান্ত : পায়ে পড়ে অনুনয় ও ছেলের আহ্বান :৫আগস্ট সকালে আরেক দফা বৈঠকে দেখা গেল পুলিশ প্রশাসনের ক্লান্তি ও ব্যর্থতার চিত্র।
আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ বলেন , “আমাদের বাহিনী ক্লান্ত , অস্ত্র ফুরিয়েছে , আমরা আর পারছি না। ” সামরিক কর্তারা জানিয়ে দেন , আর এক বিন্দুও সময় নেই। আন্দোলনকারীরা ধেয়ে আসছে গণভবনের দিকে। এই পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনাকে আলাদা একটি কক্ষে নিয়ে যান সেনা কর্মকর্তারা। তাঁরা বোঝান, এখন সিদ্ধান্ত না নিলে , হয়তো তাঁকে জীবিতই রাখা যাবে না। এ সময় শেখ রেহানা , হাসিনার ছোট বোন , পা জড়িয়ে ধরে বলেন , পদত্যাগ করতে কিন্তু শেখ হাসিনা এতেও পদত্যাগ করতে রাজি হননি। শেষমেশ যোগাযোগ করা হয় তাঁর পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের সঙ্গে। জয় যখন তাঁকে পদত্যাগের জন্য অনুরোধ করল তখন হাসিনা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। এবং : তিনি পদত্যাগ করেন।
গণভবনের শেষ মুহূর্ত ও পলায়নের আখ্যান : শেখ হাসিনা একটি টেলিভিশন ভাষণ রেকর্ড করতে চাইলেও , পরিস্থিতির দ্রুত অবনতির কারণে তা আর সম্ভব হয়নি। তাঁকে গোছাতে দেওয়া হয় মাত্র ৪৫মিনিট। তখন দুপুর ১টা। আর ৩টার সময় সেনাপ্রধান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। এর আগেই , দেশের আকাশে গর্জে ওঠে একটি সি -১৩০ সামরিক পরিবহন বিমান। তিনি এবং তার বোন শেখ রেহানা সেই সামরিক বাহিনীর বিমানে করে আগরতলা হয়ে দিল্লিতে পৌঁছান।
১৬বছরের অবসান , এক নতুন ভোরের সম্ভাবনা :সেদিন বিকেল ৩টায় সেনাপ্রধান ওয়াকের -উজ-জামান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশত্যাগের সত্যতা নিশ্চিত করেন। দীর্ঘ এক শাসনের পর্দা নামল , কিন্তু সেই পর্দার আড়ালে রেখে গেল অগণিত প্রশ্ন , অশ্রু , এবং সাহসের ইতিহাস। রাজনীতির গ্লানিপূর্ণ অধ্যায় শেষে সেই বিকেলে ঢাকার আকাশে যখন সূর্য পশ্চিমে হেলান দিল , তখন দেশের মানুষ চোখ মেলল নতুন ভোরের দিকে , এক মুক্ত

কেউ বলল, "এটাই গণজাগরণের ফল", কেউ বলল, "শহীদের রক্ত বৃথা যায়নি।" কেউ কেউ চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, "আলহামদুলিল্লাহ!" আবার কেউ লুটিয়ে পড়ল সেজদায়। এই মুহূর্তটি কেবল একটি রাজনৈতিক পালাবদল নয়—এ যেন একটি জাতির দাসত্ব থেকে মুক্তির ঘোষণা। মানুষ বুঝে গেল, তারা আর পরাধীন নয়, তারা একা নয়। তারা নিজের জন্য, নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য লড়তে পারে—এবং জয়লাভ করতেও পারে। এ ছিল বিজয়ের প্রথম আলো—যেখানে অন্যায়ের প্রাসাদ ভেঙে জন্ম নেয় সম্ভাবনার নতুন ভোর। মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করল, এই দেশ আবার গড়া যাবে, এই মাটিতে আবার সুবিচার, সাহস ও আলোর শাসন কায়েম হবে। শুধু একজন শাসকের পতন নয়—এটি ছিল এক দীর্ঘশ্বাসের পর মুক্ত নিঃশ্বাস, একটি প্রজন্মের বিজয়, এবং একটি জাতির জেগে ওঠা।

শিক্ষা: অন্যায়ের শাসন কখনোই চিরস্থায়ী হয় না। জনগণের ঐক্য, সাহস এবং ত্যাগের সম্মিলিত শক্তিই সর্বোচ্চ শক্তি—অপরাজেয় এক মহাশক্তি। যদি সত্য ও ন্যায়ের পথে অটল থাকা যায়, তবে অন্ধকারের যত দুর্গই হোক না কেন, একদিন তা ভেঙে পড়ে; আর ঠিক তখনই ফোটে মুক্তির নতুন প্রভা। তার জ্বলন্ত প্রমাণ ২০২৪ সালের ৫ই আগস্ট। এটি ছিল ইতিহাসের এক ব্যতিক্রমী মুহূর্ত, যেখানে শুধু একজন প্রধানমন্ত্রীই নয়, বরং শত শত সংসদ সদস্য, সচিব, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, এমনকি জাতীয় মসজিদের খতিব পর্যন্ত দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনা প্রমাণ করে একটি সংগঠিত জাতির জাগরণ ও প্রতিবাদ কতটা দুর্বার হতে পারে। এটি বিশ্বের ইতিহাসে এক অনুপম দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

যখন এক অবসন্ন জাতি হতাশার অতলে নিমজ্জিত, রাজনীতি আর দুর্নীতির ঘূর্ণিপাকে বিধ্বস্ত, তখনই এক আশ্চর্য মোড়ে ইতিহাস নেয় নতুন বাঁক। শেখ হাসিনার ভারত পলায়নের পর রাষ্ট্রীয় শূন্যতার এক জটিল পর্বে, মুহাম্মদ ইউনূস হয়ে ওঠেন এক নতুন ... যিনি শুধু একজন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ নন, বরং হয়ে উঠেন দেশের হাল ধরার প্রতীক। তিনি ক্ষমতায় এসেই যে দৃঢ় বার্তা দিয়েছিলেন তা ছিল দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠনের। সেই বার্তার প্রথম প্রতিধ্বনি ছিল প্রবাসী বাংলাদেশিদের হৃদয়ে। তারা ড. ইউনূসের ওপর আস্থা রেখে দেশে বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠাতে শুরু করে, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনন্য রেকর্ড

পরিচয়ও দিয়েছেন। দীর্ঘ সময় ধরে দেশের রাজনীতিকে জিম্মি করে রাখা আওয়ামী লীগ ও তাদের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জনরোষ চরমে উঠেছিল। ড . ইউনূস শুরুতে এই নিষিদ্ধ ঘোষণায় দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন , কিন্তু শিক্ষার্থী ও জনসাধারণের প্রবল চাপ , আন্দোলন ও গণআন্দোলনের মুখে অবশেষে তিনি বাধ্য হন তাদের নিষিদ্ধ করতে। যদিও এটি দেরিতে নেওয়া সিদ্ধান্ত ছিল , তবুও এর প্রভাব ছিল ব্যাপক। জনগণ এটিকে সাহসী পদক্ষেপ হিসেবে দেখেছিল। এছাড়াও তিনি ভারতের সাথে আপোষ করেননি বরং ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন। সীমান্ত হত্যাকাণ্ড , নদী শাসন , জল চুক্তি —এসব বিষয়ে তিনি নির্ভীকভাবে বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলেছেন। ফলে ভারত তাকে সরাতে নানা অপচেষ্টা চালায়। শুরু হয় কূটনৈতিক চাপ , আমদানি-রপ্তানিতে বাধা , এমনকি ভারতীয় ভিসাও একপর্যায়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভারতীয় গণমাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে চালানো হয় অসংখ্য অপপ্রচার। এই ষড়যন্ত্রের একটি প্রকাশ্য রূপ নেয় ২০২৪ সালের শেষভাগে। ড . ইউনূসকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ভারত হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন দেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ইস্কন (ISKCON)-কে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। চট্টগ্রামে তারা একটি ‘মহাসম্মেলন ’-এর আয়োজন করে, যেখানে হাসিনাকে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা প্রকাশ্যে আনা হয়। এই সম্মেলনের অন্যতম নেতৃত্বদাতা ছিল ইস্কনের প্রধান চিন্ময় কৃষ্ণ দাস। রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে তাঁকে ২৫ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন তাঁকে চট্টগ্রাম আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাঁর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর অনুসারীরা মুক্তির দাবিতে আদালত চত্বরে বিক্ষোভ শুরু করে এবং পুলিশি প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ

একদিকে প্রগতিশীলতার প্রতীক হলেও, অপরদিকে কিছু ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মহলে বিতর্কের জন্ম দেয়।

ঢাকায় জাতিসংঘের বিশেষ মানবাধিকার দফতর স্থাপনের অনুমতি। যা বহু মানুষের কাছে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়।

এছাড়াও আরো অনেক অভিযোগ রয়েছে তিনি ও তার উপদেষ্টামন্ডলীদের ব্যাপারে। যেমন এক উপদেষ্টা যৌনকর্মীদের ২ কোটি টাকা অনুদান দিয়ে জনমনে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে।

এই দুই মুখের নেতৃত্ব —একদিকে সাহসিকতা, অন্যদিকে বিতর্ক —ড. ইউনূসকে রূপ দেয় একজন জটিল নেতায়। যিনি কখনো ছিলেন দেশের নতুন ভোরের আকাশে প্রথম সূর্য, আবার কখনো বিতর্কিত মেঘের আড়ালে ঢেকে থাকা এক আলো। তবুও ইতিহাসে তাঁর স্থান অস্বীকার করা যাবে না। তাঁর আগমনে হতাশ জাতি কিছুটা হলেও দিশা খুঁজে পেয়েছিল। কিছুটা হলেও ভেবেছিল —এখনো সব শেষ হয়ে যায়নি। আর সেই বিশ্বাসই ভবিষ্যতের সম্ভাবনার বীজ রোপণ করেছিল। ড. ইউনূস সফল না ব্যর্থ —তা সময় বলবে, কিন্তু তিনি যে সময়ের দাবিতে জেগে ওঠা এক চরিত্র, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ড. ইউনূস যখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন তাঁর দৃঢ় নেতৃত্ব, স্বচ্ছতা এবং ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান ভারতের শাসকগোষ্ঠীর জন্য হয়ে ওঠে এক গোপন আতঙ্ক। বিশেষ করে তিনি সীমান্তে হত্যাকাণ্ড, পানি আগ্রাসন, আমদানি-রপ্তানিতে বৈষম্য, ট্রানজিট চুক্তি, এবং ভারতের হস্তক্ষেপমূলক কূটনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করায় ভারত সরাসরি রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রে নামে। ভারতের নীতিনির্ধারক মহল স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে —ড. ইউনূস তাদের স্বার্থরক্ষাকারী নন; বরং তিনি হলেন বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থরক্ষায় অটল এক প্রতীক।

এর ফলে শুরু হয় বহুমাত্রিক আক্রমণ: কূটনৈতিক চাপ, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার হুমকি, আমদানি-রপ্তানিতে বাধা, ভিসা স্থগিতকরণ, এমনকি জলচুক্তি ঝুলিয়ে রাখা হয়। কিন্তু এই প্রবল চাপের মুখেও ড. ইউনূস নতিস্বীকার করেননি; বরং জাতির স্বার্থেই থেকেছেন অনমনীয়। এই ষড়যন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব ছিল লালমনিরহাটে একটি সামরিক বিমানঘাঁটি চালুর উদ্যোগ — এই ঘাঁটি বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা

"স্ট্র্যাটেজিক ন্যাকলপয়েন্ট" বলে চিহ্নিত করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ভারতের কিছু রাজনৈতিক নেতার বক্তব্যে উঠে আসে ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত। ভারতের বিজেপি-ঘনিষ্ঠ এক সাংসদ শুভেন্দু অধিকারী, এক প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলেন—"বাংলাদেশ এখন ভারতের নিরাপত্তার হুমকি। আমাদের যদি প্রয়োজন হয়, আমরা বাংলাদেশে ঢুকতেও পারি।" এই বক্তব্য কেবল অগ্রহণযোগ্যই নয়, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক প্রটোকল লঙ্ঘনের শামিল। একই বক্তৃতায় তিনি ড. ইউনূসকে 'জেহাদি চরিত্র' বলে অভিহিত করে অবমাননাকর মন্তব্য করেন, যা দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভয়াবহ বার্তা দেয়। এই সময়েই ভারতের অন্যতম অস্ত্র হয়ে ওঠে—মিডিয়া অপপ্রচার। ভারতের বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক গণমাধ্যমে চালানো হয় সুপরিকল্পিত বিভ্রান্তি ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালানো হয়, তার মধ্যে অন্যতম ছিল—"বাংলাদেশ জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে" "বাংলাদেশে হিন্দু নিধন চলছে" "বাংলাদেশে কোনো হিন্দুই নিরাপদ নয়" এই প্রপাগান্ডার মূল উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং ড. ইউনূসকে একটি চরমপন্থী আদর্শের প্রতিনিধিরূপে উপস্থাপন করা। ভারতের মিডিয়াতে এই অপপ্রচারে সামনের কাতারে ছিলেন সাংবাদিক ময়ুখ রঞ্জন ঘোষ। এছাড়াও Times Now, Zee News, Republic TV, India Today, OpIndia, Dainik Jagran, News18, ABP News, Sudarshan News, Janmat, India TV-র মতো মিডিয়াগুলোতে প্রচারিত হয় অসংখ্য ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রতিবেদন। ড. ইউনূসকে চিত্রিত করা হয় 'জঙ্গি-সহানুভূতিশীল', 'ইসলামপন্থী গোষ্ঠীর মুখপাত্র', এমনকি 'পাকিস্তানের দালাল' হিসেবেও।

ভারত এখানেই থেমে থাকেনি। সীমান্তে সেনা মোতায়েন বাড়ায়, সীমান্তে হামলার ভয়াবহতা বৃদ্ধি পায়, এমনকি "বাংলাদেশ ভারতের নিরাপত্তার হুমকি"—এই মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় উত্তেজনা

ভাড়া করে মিথ্যে বলানো হয়েছে —এমনকি অনেক বিপদগ্রস্ত মুসলিমকে তারা হিন্দু বানিয়ে প্রচার করেছে, যাতে আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়।

সর্বশেষ কথা : ইতিহাস ও বাস্তবতা আজ স্পষ্ট করে দিয়েছে —ভারত আমাদের বন্ধু নয়। সীমান্তে হত্যা, পানি আগ্রাসন, বাণিজ্য বৈষম্য, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ —সবই প্রমাণ করে তারা শত্রুর মতো আচরণ করেছে বারবার। তাদের সহযোগিতার মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে আছে আধিপত্যের নেশা। আজ সত্য স্বীকার করার সময়—ভারত আমাদের শত্রু ,এবং তাদের দালালরা জাতির জন্য বিপদ। যারা বাংলাদেশি হয়ে ভারতের জয়গান গায়, তাদের বলি --এখনই থামো, না হলে ইতিহাস তোমাদের বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত করবে। এ জাতির হুঁশ ফেরাতে হবে —ভ্রান্ত ভালোবাসা নয়, দরকার নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা। দেশকে বাঁচাতে হলে এখনই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

১৯০০ সালের ব্রিটিশ প্রশাসন চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস রেগুলেশন ১৯০০ এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করেছিল। এতে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ভূমি ও সংস্কৃতি রক্ষার নিশ্চয়তা ছিল[1]। কিন্তু পাকিস্তান আমলে এবং বিশেষত ১৯৬২ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে প্রায় এক লক্ষ পাহাড়ি বাস্তুচ্যুত হয় —এর মধ্যে প্রায় ৪০,০০০ জন ভারতে আশ্রয় নেয়[2]। স্বাধীনতার পর পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশা ছিল সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু ১৯৭২ সালের সংবিধানে তাদের জাতিগত পরিচয় মুছে ফেলা হয়, তারা কেবল "বাংলাদেশের নাগরিক" হিসেবে উল্লেখিত হয়[3]। এর প্রতিবাদে ১৯৭২ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা চার দফা দাবি উপস্থাপন করেন—স্বায়ত্তশাসন, ১৯০০ সালের আইন পুনঃপ্রবর্তন, ভূমি অধিকারের নিশ্চয়তা এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ[4]। সরকার তা প্রত্যাখ্যান করলে ১৯৭৩ সালে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পি সি জে এস এস)[5]। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগে মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা ভারতীয় মিজোরামে পালিয়ে যান। সেখানেই ভারতের

গেরিলা যুদ্ধ, অ্যাম্বুশ কৌশল, বিস্ফোরক তৈরি ও রেডিও যোগাযোগ শেখানো হতো। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কিছু কর্মকর্তা সরাসরি প্রশিক্ষক হিসেবে যুক্ত ছিলেন—এ তথ্য পাওয়া যায় ১৯৯১ সালে কানাডার ন্যাশনাল আর্কাইভে সংরক্ষিত একটি রিপোর্টে[12]। আর এ ডব্লিউ-এর সহায়তা শুধু প্রশিক্ষণেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তারা নিরাপদ আশ্রয়, চিকিৎসা, রসদ এবং রাজনৈতিক লবিংয়ের সহায়তাও দিত। ১৯৮৪ সালের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—তখন বাংলাদেশের সেনাবাহিনী শান্তি বাহিনীর একটি কনভয় আটক করে, যেখানে ভারত থেকে আসা অস্ত্রবাহী ট্রাক ধরা পড়ে। ঘটনাটি চট্টগ্রাম সেনানিবাসের গোয়েন্দা রিপোর্টে নথিভুক্ত হয়[13]।

তবে ভারতের সহায়তার ধারা সবসময় সমান ছিল না। ১৯৭৭ সালে মোরারজি দেশাই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর কিছু সহায়তা কমে যায়, কিন্তু ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ফিরলে আবার তা বাড়ে। এ সময় শান্তি বাহিনীর শিবিরে ভারী অস্ত্র প্রশিক্ষণ শুরু হয়, যার মধ্যে ছিল রকেট লঞ্চার এবং ৮২ মিমি মর্টার[14]। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সংঘাতে আনুমানিক ২৫ হাজার মানুষ নিহত হয়—যার মধ্যে ৬ হাজার সেনা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, এবং বাকিরা সাধারণ পাহাড়ি ও বাঙালি নাগরিক[15]। প্রায় ১ লক্ষ পাহাড়ি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়, যারা মূলত ত্রিপুরা ও মিজোরামে অবস্থান করত[16]। এই দীর্ঘ সংঘাতের অবসান ঘটে ১৯□৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী শান্তি বাহিনী অস্ত্র জমা দেয় এবং ভারতে অবস্থিত শিবিরগুলো বন্ধ করে দেয়[17]। কিন্তু অনেক পাহাড়ি মনে করে, ভারতের সহায়তা আসলে তাদের স্বার্থে নয়, বরং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা বজায় রাখার কৌশল ছিল[18]। এই ইতিহাস প্রমাণ করে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্থিরতা কেবল অভ্যন্তরীণ অবিচারের ফল নয়, বরং আঞ্চলিক কূটনীতির গভীর খেলায় ব্যবহৃত একটি উপকরণ ছিল—যেখানে আর এ

সূত্র -

- [1] ব্রিটিশ সরকারি আইন [illegible], 1900
- [2] A. M[illegible] Development, 2003
- [3] বাংলাদেশ সংবিধান, ১৯৭২
- [4] PCJSS ঐতিহাসিক দলিল, বাংলাদেশ মন্ত্রণালয় প্রকাশনা
- [5] S. R. Chowdhury, Ethnic Politics in Bangladesh, 1990
- [6] কানাডার ন্যাশনাল আর্কাইভ, ১৯৯১
- [7] South Asian Intelligence Review, India’s Foreign Intellig[illegible], ২০০৪
- [8] University of Dhaka, Chittagong Hill Tracts Peace Accord: A Diplom[illegible], ২০১০
- [9] বাংলাদেশের সামরিক আর্কাইভ (অনাধিকারপ্রাপ্ত নথি),
- [10] Amn[illegible] Human Rights Viol[illegible] in the Chittagong Hill Tracts, ১৯৯৫
- [11] UNHCR রিপোর্ট, Conflict and Displacement in CHT, ২০০০
- [12] Ban[illegible] Documents, ১৯৯৭
- [13] https://en.wikipedia.org/wiki/Chittagong_Hill_Tracts_Peace_Accord
- [14] Amnesty International, ১৯৯৫
- [15] UNHCR রিপোর্ট, ২০০০
- [16] Ibid

শেখ হাসিনা ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পর , ড. ইউনূস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেতৃত্ব দেন। এই সময় বাংলাদশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নেতা কর্মীরা বিভিন্ন স্থানে চাঁদাবাজি , হুমকি , জোরপূর্বক জমি দখল এবং ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার মাধ্যমে দেশের আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করে। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানকেও বিএনপি ও তাদের মিত্ররা নানা ভাবে অস্বীকার বা বিতর্কিত ব্যাখ্যা প্রদান করে ; কেউ কেউ এই অভ্যুত্থান নিজেদের বলেও দাবি করে। ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়ি ভাঙার ঘটনায় ছাত্রসমাজের কর্মকাণ্ড নিয়ে বিএনপির অনেক নেতা - কর্মী তীব্র সমালোচনা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করায় তাদের কেউ কেউ সরকারের সমালোচনা করে। এমনকি আওয়ামীলিগ সন্ত্রাসী গোষ্ঠী যারা ১৬ বছর এদেশের শাসনের নামে শোষন করেছে তাদের কে নিষিদ্ধ করতে বাধা সৃষ্টি করে। যেই দল হাসিনার আমলে বাইরে বের হতে ভয় পেত ,প্রকাশ্যে নেত্রীর পক্ষে কথা বলতে সাহস পেত না , যারা নিজের নেত্রীকে বিদেশে চিকিৎসা করাতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং নেত্রীর বাড়ির সামনে থেকে বালুর ট্রাক সরাতে পারেনি , তারাই হাছিনার পক্ষপাতিত্ব করেছে। এমনকি সেই তারাই আজ ৫ই আগস্টের পর হয়ে উঠেছে স্বৈরাচারের প্রতীক। দিনের পর দিন যারা ঘরে থাকতে পারত না , নির্যাতিত ছিল; কিন্তু আজ যেন তারা তাদের অতীত ভুলে গেছে। বিএনপির এই চাঁদাবাজি , মানুষ হত্যা ও জোরপূর্বক জমি দখলের মতো অপকর্মের কারণে সাধারণ মানুষের মনে গভীর অস্থিরতা ও অবিশ্বাস জন্ম নিয়েছে। এসব অপরাধ তাদের রাজনৈতিক আস্থা ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে, যা দলের ভবিষ্যতকে এক অনিশ্চিত পথে ঠেলে দিয়েছে।

আর তাদের প্রধান জিকিরই যেন হয়ে উঠেছিল নির্বাচন , নির্বাচন , নির্বাচন। কারণ তারা বিগত ১৬

তৃতীয়
অধ্যায়: প্রতিশঅ্রধু্তিযর া৫য৪়বছর – উন্নয়ন কোথায়? দুর্নীতি, অবহেলা ও বিপন্ন জাতি

ভূমিকা

স্বাধীনতার আলো যখন আমাদের আকাশে ভোরের প্রথম কিরণ ফেলে, আমরা ভেবেছিলাম—এ পৃথিবীতে আর কোন কষ্ট, কোন অনাচার থাকবে না। রক্তের বিনিময়ে অর্জিত মুক্তি যেন ন্যায় ও সমৃদ্ধির নতুন সূর্যোদয় আনবে। কিন্তু আজ, সেই আশার সূর্য ডুবে যাচ্ছে অন্ধকার দুর্নীতির গহ্বরে। রাজনৈতিক প্রতারণা, স্বার্থপরতা আর লুটপাটের আঁধারে ডুবে গেছে আমাদের বাংলাদেশ। সাধারণ মানুষের স্বপ্ন, আশাবাদ, এমনকি তাদের মৌলিক অধিকার—সবকিছু যেন ধূলিসাৎ। বিচারহীনতা ও দমননীতি মানুষের হৃদয়ে বিষ বুনেছে, আর সেই বিষ এখন রাষ্ট্রের প্রতিটি শিরায় বইছে।

কত রক্তের বিনিময়ে আমাদের পা টেকেছিল স্বাধীনতার মাটিতে! অথচ আজ সেই মাটিই কলুষিত হয়ে পড়েছে। স্বাধীনতার পর যেই দলই ক্ষমতায় এসেছে, তারা সৃষ্টি করেছে ত্রাসের রাজত্ব। খুন, গুম, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, জোরপূর্বক জমি দখল—কোন অপরাধই বাকি রাখেনি। বিদেশে পাচার হয়েছে বিপুল অর্থ, অথচ দেশের মানুষ অন্ন-বস্ত্রের অভাবে হাহাকার করছে। দলের অধিকাংশ নেতা-কর্মীর নেই বৈধ আয়ের উৎস; তারা চলে শুধু চাঁদা, লুটপাট আর দুর্নীতির টাকায়। আজ দুর্নীতির বিষাক্ত ছোবল ঢুকে পড়েছে প্রতিটি সেক্টরে—স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়; পুলিশ, প্রশাসন, ব্যাংক, আদালত; স্বাস্থ্যখাত থেকে যোগাযোগব্যবস্থা, এমনকি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত। রন্ধ্রে রন্ধ্রে রাজনীতি ঢুকে গেছে এদেশের প্রতিটি জায়গায়। শিক্ষক নিয়োগ থেকে চাকরির পোস্টিং, টেন্ডার থেকে চিকিৎসার বেড—সবকিছুর মূলে দলীয়করণ আর স্বজনপ্রীতি। যোগ্যতা আর সততা এখানে মূল্যহীন, কেবল দলের রঙ আর টাকার শক্তিই নির্ধারণ করে মানুষের ভাগ্য।

বাস্তবতা ভুলে যায়। বিশ্ববাসীর চোখে বাঙালি আজ কেবল প্রতারক, দুই নাম্বার ও চিটার জাতি হিসেবেই পরিচিত। কারণ আমাদের আচরণে, আমাদের রাজনীতিতে, এমনকি দৈনন্দিন জীবনের লেনদেনেও প্রতারণা আর দুই নাম্বারির ছাপ স্পষ্ট। এ যেন আমাদের রক্তে মিশে যাওয়া এক অশুভ অভ্যাস, যা থেকে আমরা এখনও মুক্ত হতে পারিনি। তাহলে প্রশ্ন—এ কি সেই স্বাধীনতার বাংলাদেশ, যার জন্য লক্ষ প্রাণ আত্মাহুতি দিয়েছিল? নাকি আমরা কেবল এক নতুন দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে আছি, যেখানে শাসকের মুখ পাল্টায়, কিন্তু শোষণের রূপ পাল্টায় না? আগামী অধ্যায়ে আমরা বিশ্লেষণ করব—উন্নয়নের নামে যে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, তার আড়ালে আসলে কী ঘটে চলেছে। কীভাবে দুর্নীতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও ভণ্ড প্রতিশ্রুতির জালে বন্দী হয়ে আছে আমাদের দেশ।
বিশেষ করে তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা খুঁজব সেই উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির সত্যতা—এটা কি বাস্তব, নাকি কেবল একটি সাজানো মুখোশ?
স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের পর অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে। প্রতিটি সরকার এসেছে উন্নয়নের মায়াবী স্বপ্ন হাতে নিয়ে—আকাশচুম্বী প্রতিশ্রুতির মালা গেঁথে দিয়েছে জাতির কানে।
কিন্তু আজ প্রশ্ন জাগে: সে প্রতিশ্রুতির আলো কি সত্যিই সাধারণ মানুষের ঘরে পৌঁছেছে, নাকি কেবল কিছু প্রভাবশালী মহলের অট্টালিকার আঙিনায় বন্দী হয়ে আছে?
এই অধ্যায়ে আমরা উন্মোচন করব সেই আড়ালের চিত্র—

- কীভাবে উন্নয়নের নামে দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক অনিয়মের চোরাবালি আমাদের দেশকে গ্রাস করেছে।
- কীভাবে মেগা প্রকল্প ও ব্যাংক লুটের অন্ধকার সুড়ঙ্গে হারিয়ে গেছে কোটি কোটি মানুষের ঘামঝরা শ্রমের ফসল।
- কীভাবে সরকারি ত্রাণ ও ভাতার পাত্র থেকে ক্ষুধার্তের আহার কেড়ে নিয়ে নিজের ভুয়া তালিকায় নাম লিখিয়েছে দুর্নীতিবাজরা

এছাড়া আমরা দেখব , প্রতিরক্ষা খাতে দুর্নীতির কারণে কীভাবে আমাদের সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, আর দেশের নিরাপত্তা দাঁড়িয়েছে প্রশ্নবিদ্ধ অবস্থায়।

অবশেষে, এই অধ্যায় খুঁজবে এক আশার আলো —কোন পথে উত্তরণের সম্ভাবনা , কোথায় সেই পথ যা দুর্নীতি , অবহেলা ও ভণ্ড প্রতিশ্রুতির শেকল ভেঙে জাতিকে সত্যিকারের উন্নয়নের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে পারে।

স্বপ্ন দেখে যিনি কাজ করেন না , বাস্তবতা তাকে মিথ্যাকার বলে দেয়। ” বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাস যেন এই প্রবাদেরই প্রতিচ্ছবি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর দেশবাসী কল্পনা করেছিল দুর্নীতিমুক্ত এক নতুন রাষ্ট্রের। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে প্রতিটি মানুষ চেয়েছিল ন্যায়ের ভিত্তিতে পুনর্গঠনের পথচলা। কিন্তু বাস্তবতা দ্রুতই ভিন্ন চিত্র ফুটিয়ে তুলল। আন্তর্জাতিক সাহায্য , খাদ্যশস্য ও নগদ অর্থ একের পর এক প্রবাহিত হলেও সেগুলোর সিংহভাগ আটকে যায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও ক্ষমতাশালীদের ভাণ্ডারে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বরাদ্দ অর্থও সঠিকভাবে বিতরণ হয়নি। ইতিমধ্যেই ১৯৭২ –৭৩ সালেই অভিযোগ ওঠে যে ত্রাণসামগ্রী কালোবাজারে বিক্রি হচ্ছে , খাদ্যশস্য গুদামে পচে যাচ্ছে অথচ মানুষ না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। স্বাধীনতার অঙ্গীকার দুর্নীতির অন্ধকারে ঢেকে যায়। “ঢেকে রাখলে অন্ধকারে গন্ধ থাকে। ” ১৯৭৫ সালের পর শুরু হয় সামরিক শাসন। ১৯৭৭ –১৯৮২ সালের মধ্যে রাস্তা , সেতু ও শিল্প কারখানার প্রকল্প ঘোষণা করা হলেও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার ও বাজেট ফুলানোর কারণে অধিকাংশ প্রকল্প অল্পদিনেই অচল হয়ে পড়ে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ থেকে কোটি কোটি ডলার ঋণ নেওয়া হলেও তার বড় অংশ প্রশাসনিক ব্যয় ও কমিশনে খরচ হয়। ১৯৮২ সালে এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর কিছু অবকাঠামো প্রকল্প শুরু করেন , কিন্তু টেন্ডারবাজি ও স্বজনপ্রীতির কারণে প্রকৃত উন্নয়ন হয়নি। শহুরে আলোয় গ্রাম জ্বলছে অন্ধকারে। ” ১৯৯০ সালে

পদ্মা সেতুর খরচ প্রথমে ধরা হয়েছিল প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা, কিন্তু ২০২২ সালে উদ্বোধনের সময় ব্যয় দাঁড়ায় ৩০ হাজার কোটি টাকারও বেশি। কানাডিয়ান প্রতিষ্ঠান এসএনসি-লাভালিনের সঙ্গে ১০–১২ শতাংশ কমিশনের চুক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। ২০১১ সালে বিশ্বব্যাংক দুর্নীতির অভিযোগে প্রকল্প থেকে সরে দাঁড়ায়। যদিও সেতু শেষমেশ নির্মিত হয়, কিন্তু ব্যয়ের তিনগুণ বৃদ্ধি জনগণের কাঁধে বিশাল ঋণের বোঝা চাপায়। মেট্রোরেল প্রকল্পও একই চিত্র বহন করে। ২০১২ সালে অনুমোদিত এই প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও ২০২২ সালে প্রথম ধাপ উদ্বোধনের আগেই ব্যয় বেড়ে দ্বিগুণ হয়। জাইকার আপত্তি অগ্রাহ্য করে রাজনৈতিক প্রভাবে পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়, এবং নির্মাণসাইট থেকে কোটি টাকার সামগ্রী চুরির ঘটনাও সংবাদমাধ্যমে আসে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে ২০১৮ সালে আবাসন খাতে "বালিশ কেলেঙ্কারি" প্রকাশ পায়, যেখানে একটি বালিশের দাম বাজারমূল্যের চল্লিশ গুণ দেখানো হয়। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পেও ২০২৩ সালে অভিযোগ ওঠে যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের জন্য বরাদ্দ ফ্ল্যাটের বড় অংশ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। এই সমস্ত প্রকল্পের বাইরেও একটুকরো সামাজিক ও ধর্মীয় প্রকল্প যেমন মডেল মসজিদ নির্মাণেও দুর্নীতির ছাপ পরেছে। সৌদি আরব থেকে দেওয়া অর্থ দিয়ে এই মসজিদ নির্মাণ হলেও সরকারী প্রচারণায় এর কৃতিত্ব এককভাবে শেখ হাসিনার নামে তুলে ধরা হয়েছে, যা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গে, শেয়ার ব্যবসায় আর্থিক অনিয়মে সালমান এফ রহমানের নাম জড়ানোর অভিযোগ উঠে; যেখানে শেয়ার বাজারের কিছু ব্যবসায়ীদের অর্থ দিয়ে বড় পরিসরের দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে বলে সংবাদমাধ্যমে উল্লেখ রয়েছে। এই ঘটনা প্রতিফলিত করে, শুধুমাত্র প্রকল্প নয়, দেশের অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর শীর্ষ পর্যায়েও দুর্নীতির

অন্তত ৭৭ হাজার কোটি টাকা থেকে এক লাখ কোটি টাকা পর্যন্ত ঘুষ সরকারি কর্মকর্তাদের পকেটে গেছে, আর ৭০ হাজার কোটি থেকে এক লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত রাজনৈতিক মহলে ভাগ হয়েছে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক হলো—এ দুর্নীতির বড় অংশ সংঘটিত হয়েছে আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনামলে। বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সময়ও অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছিল, বিশেষ করে ২০০১–২০০৬ সালের বিএনপি আমলে ব্যাপক ঘুষ ও প্রকল্পের টাকা আত্মসাত হয়েছিল।

তবে ২০০৯–২০২৪ সালের আওয়ামী লীগের আমলে দুর্নীতির আকার ও মাত্রা ভয়াবহ রূপ নেয়, যা আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থাগুলোর প্রতিবেদনেও প্রমাণিত। এই সত্য ঘটনাগুলো প্রমাণ করে, উন্নয়ন বাংলাদেশের জন্য একটি প্রয়োজনীয় যাত্রা হলেও দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক অনিয়মের বোঝা তার আসল সাফল্যকে কলঙ্কিত করেছে। স্বাধীনতার অঙ্গীকার ছিল জনগণের জন্য সমৃদ্ধি, কিন্তু বাস্তবে উন্নয়ন হয়েছে বিলবোর্ড, প্রচারণা আর ক্ষমতাসীনদের বাহাদুরিতে। প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন দুর্নীতির এই মহীরুহ উপড়ে ফেলে রাষ্ট্র জনগণের কাছে দায়বদ্ধ হবে। অন্যথায় উন্নয়নের নাম থাকবে, কিন্তু তার প্রকৃত সুফল নাগরিকের ঘরে পৌঁছাবে না।

সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দুর্নীতি: বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতাগুলোর একটি হলো সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দুর্নীতি। দেশের নীতি-নির্ধারণী পর্যায় থেকে শুরু করে প্রশাসনিক শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত দুর্নীতি এক ভয়াবহ সংস্কৃতিতে রূপ নিয়েছে, যা রাষ্ট্র ও জনগণের আস্থা ক্ষুণ্ন করেছে। পুলিশ, সেনাবাহিনী ও মন্ত্রিপরিষদের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নাম বারবার অভিযোগের মুখে উঠে এসেছে।

পুলিশ বাহিনীতে দুর্নীতির ঘটনা বহুল আলোচিত। সাবেক আইজিপি ও পুলিশ প্রধান বেনজীর শীর্ষ

আস্থাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। রাজনৈতিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের দুর্নীতি অত্যন্ত প্রচলিত। এমপি ও মন্ত্রীরা সরকারি প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য অনিয়মে লিপ্ত থাকেন। সরকারি হিসাব অনুসারে , এক লাখ কোটি টাকার অধিক বাজেট দুর্নীতির জন্য হাতবদল হয়েছে , যার মূল ভাগ উচ্চপদস্থ রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন গণমাধ্যম ও তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে , ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রিপরিষদের কিছু সদস্য শেয়ার ব্যবসা , ব্যাংক ঋণ কেলেঙ্কারি ও বিদেশি অর্থ পাচারে জড়িত ছিলেন। বিশেষ করে সালমান এফ রহমানের নাম এসব অনিয়মের সাথে যুক্ত হয়েছে। শেয়ার ব্যবসায়ীদের অর্থ আত্মসাৎ করে তিনি বড় ধরনের আর্থিক দুর্নীতি করেছেন বলে বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই সমস্ত তথ্য ও প্রমাণ সত্ত্বেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দুর্বল। রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে অনেক ঘটনা গোপন রাখা হয় বা তদন্ত বাধাগ্রস্ত হয় যার ফলে দুর্নীতিবাজরা প্রায়শই কাঠগড়ার বাইরে থাকেন , আর সাধারণ মানুষের আস্থা ও আশা ক্রমেই হ্রাস পায়। সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দুর্নীতি দেশকে অর্থনৈতিক দুর্দশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণ শুধু কঠোর আইন প্রয়োগ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করেই সম্ভব। জনসাধারণের আস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর স্বতন্ত্রতা। তবেই উন্নয়নের প্রকৃত সুফল দেশের সব শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে। শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের দুর্নীতির চিত্র : বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অর্থনীতিতে দুর্নীতি শুধু সরকারি প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়—ক্ষমতাসীন শীর্ষ পর্যায় ও সরকারের মূল পরিবারেও দুর্নীতির

বিদেশি সম্পত্তি ও অর্থ পাচার : যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, হংকং ও যুক্তরাষ্ট্রে শেখ পরিবারের নামে কোটি কোটি ডলারের সম্পদ ও তথাকথিত ‘রুশ স্লাশ ফান্ড’ সন্ধান পাওয়া গেছে; জয় ও টিউলিপের বিদেশি সম্পত্তি ও ব্যাংক লেনদেনের তদন্ত শুরু হয়েছে। জয় $300 মিলিয়নের বেশি বিদেশ পাঠানোর অভিযোগে তদন্তের মুখে; তাঁর বিরুদ্ধে বিলাসবহুল গাড়ি ও বাড়ির মালিকানার প্রমাণও উন্মুক্ত হয়েছে।

টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে মালয়েশিয়ায় মিলিয়ন ডলারের ম্যানি লন্ডারিং অভিযোগ উঠে, ১২টি দেশে তদন্ত চলছে, এবং একটি £700,000 মূল্যের লন্ডনের ফ্লাটের জন্য নকল নোটারির অভিযোগ আসে। সারাংশ ও পর্যবেক্ষণ : শেখ হাসিনা ও পরিবারের সদস্যরা — সপ্তম, নবম ও দশম পর্যায়ের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে —দুদকের অভিযোগ, আদালতের নিষেধাজ্ঞা ও আন্তর্জাতিক অনুসন্ধানের আবরণে রয়েছে।

Tk 59,000 কোটি রূপপুর প্রকল্প থেকে।

Tk 21,000 কোটি আশ্রয়ণ ও BEZA/BEPZA থেকে।

Tk 577.45 কোটি ও Tk 394.6 কোটি ফ্রিজ করা অ্যাকাউন্টে।

অধিক কোটি ডলারের বিদেশি সম্পত্তি ও পাচার সন্দেহে সুনির্দিষ্ট তদন্ত। এই ঘটনাগুলো স্পষ্টভাবে দেখায় —সরকারি ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থান করেও উন্নয়নের নামে দালালের মতো আর্থিক লেনদেন, ব্যাংক ও সম্পত্তিতে হাতরেখা অতিক্রম ব্যবস্থাপনাগত দুর্নীতি এবং কৃতিত্বের প্রবঞ্চনা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে দুটি সরকারি সংস্থা — বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনস অথরিটি (BEZA) এবং বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি (BEPZA)।

বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনস অথরিটি (BEZA) একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, যার কাজ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল (Economic Zones) গড়ে তোলা ও পরিচালনা করা। এই অঞ্চলগুলো বিশেষভাবে বিনিয়োগ ও শিল্পায়নের জন্য তৈরি হয়, যাতে দেশি ও বিদেশি ব্যবসায়ীরা সুবিধা পায় এবং দেশের শিল্পোন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।

BEZA-এর অধীনে দেশের অর্থনৈতিক ভৌগোলিক বিস্তার ও শিল্পায়নের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির কাজ করা হয়।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনস অথরিটি (BEPZA) বিদ্যমান রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ

BEZA নতুন শিল্পাঞ্চল তৈরি করে আর BEPZA বিদ্যমান রপ্তানি শিল্পাঞ্চল পরিচালনা করে। তবে উন্নয়ন ও বিনিয়োগ আকর্ষণের নামে এই দুই সংস্থার কার্যক্রমে দীর্ঘদিন ধরে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। BEZA-এর অধীনে জমি বরাদ্দে স্বজনপ্রীতি, প্রকল্পের বাজেট ফুলিয়ে দেখানো ও বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে কমিশন আদায় করার ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে কয়েকটি প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা থাকলেও সেখানে জমি ব্যবহার বা শিল্প স্থাপনের দেখা মেলে না। বরং অনেক জমি ফাঁকা পড়ে থাকে বা ভুয়া মালিকানায় যায়। অন্যদিকে BEPZA-তেও অবকাঠামো নির্মাণ ও টেন্ডার কার্যক্রমে কোটি কোটি টাকা বাজেট ফাঁপানোর প্রমাণ মিলেছে। ২০২১ সালের এক সরকারি প্রতিবেদনে চট্টগ্রাম ও সাভার এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনে অবকাঠামোর কাজে অর্ধেকেরও কম কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। জানা যায়, কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেছেন এবং প্রকৃত কাজে না দিয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। সরকারি তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা গেছে. ২০১৯ থেকে ২□২৪ সালের মধ্যে BEZA ও BEPZA প্রকল্পে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে দেশের শিল্পোন্নয়ন ও রপ্তানি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমে যাওয়ায় নতুন প্রকল্প স্থগিত বা বাতিল হচ্ছে. যা দেশের কর্মসংস্থান ও অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে।

পরিশেষে বলা যায়, BEZA ও BEPZA-র দুর্নীতি শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি করেনি, দেশের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বড় বাধা সৃষ্টি করেছে। উন্নয়নের নামে দুর্নীতি চলতে থাকলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি থমকে যাবে।

বাংলাদেশের [illegible] ইতিহাসে উন্নয়নের স্বপ্ন সবসময়ই মানুষের হৃদয়ে জাগ্রত থেকেছে। স্বাধীনতার পর দেশ গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষায় শাসকগোষ্ঠী অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও আধুনিকতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে। সেই ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে মেগা প্রকল্পের জোয়ার দেখা গেছে। পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, কর্ণফুলী টানেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, কিংবা পায়রা ও মাতারবাড়ি সমুদ্রবন্দর—এসব প্রকল্প জনগণের চোখে আশার প্রদীপ জ্বালালেও, বাস্তবতা অন্য এক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, অধিকাংশ মেগা প্রকল্পের ব্যয় প্রথম বাজেট অনুমানের চেয়ে দ্বিগুণ কিংবা তিনগুণে পৌঁছেছে □ উদাহরণস্বরূপ

প্রকল্পের নামে গড়ে ৭০ শতাংশ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ,
যেখানে লক্ষাধিক কোটি টাকা দুর্নীতি ও অনিয়মের
কারণে অপচয় হয়েছে। ঋণনির্ভর এসব প্রকল্প দেশের
ওপর নতুন করে ঋণের বোঝা চাপিয়েছে , যার ভার বহন
করছে সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে ব্যাংক খাত হয়ে
উঠেছে দুর্নীতি ও লুটপাটের অন্যতম ক্ষেত্র। ২০১০
থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে বেসিক ব্যাংক থেকে প্রায়
৪,৫০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়। সোনালী ব্যাংকের
হলমার্ক কেলেঙ্কারি এবং জনতা ব্যাংকসহ একাধিক
প্রতিষ্ঠানে একই ধরনের লুটপাট সংঘটিত হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের একাধিক সতর্কতা সত্ত্বেও
প্রভাবশালী রাজনৈতিক মহল ও তাদের ঘনিষ্ঠ
ব্যবসায়ীরা ঋণ নিয়ে তা ফেরত দেননি। সাম্প্রতিক
সময়ে আলোচিত সালাম গ্রুপের ঋণ কেলেঙ্কারি কিংবা
সাবেক অর্থপাচারকারী পিকে হালদারের মামলাগুলো
দেখায় , এই লুটপাটের ধারা এখনও বন্ধ হয়নি। সোনালী
ব্যাংক মামলায় কয়েকজন দণ্ডপ্রাপ্ত হলেও বৃহৎ
অপরাধীরা এখনো প্রভাবের জালে সুরক্ষিত।
এই লুটপাট ও দুর্নীতির বোঝা গিয়ে পড়ছে সাধারণ
মানুষের ঘাড়ে। একদিকে মেগা প্রকল্পের ঋণ শোধে
রাষ্ট্রীয় বাজেটের বড় অংশ ব্যয় হচ্ছে , অন্যদিকে
ব্যাংক খাতের ক্ষতি পূরণে করদাতাদের টাকাই
ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ দেশের সাধারণ মানুষ সেই
উন্নয়নের সুফল তেমন পাচ্ছে না। বরং অর্থনৈতিক
বৈষম্য দিন দিন গভীর হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক ও
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য বলছে , দেশের
শীর্ষ ১০ শতাংশ ধনী প্রায় ৪০ শতাংশ সম্পদ
নিয়ন্ত্রণ করছে , অথচ নিচের ৪০ শতাংশ মানুষের ভাগে
এসেছে ১০ শতাংশেরও কম। ঢাকায় গড়ে মাথাপিছু আয়
গ্রামের তুলনায় দ্বিগুণ , ফলে শহর-গ্রামের বৈষম্য
ক্রমশ বাড়ছে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের এই চিত্র কেবল
সংখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ; এর প্রভাব পড়ছে
মানুষের শিক্ষা , স্বাস্থ্য ও জীবনের মানে।
ঋণখেলাপি ও লুটপাটের কারণে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা
সহজে ঋণ পাচ্ছে না , ফলে তাদের ব্যবসার প্রসার

নিরীক্ষা ও জবাবদিহি থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, ব্যাংক খাতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করে বাংলাদেশ ব্যাংককে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, যাতে ঋণ অনুমোদন ও আদায় প্রক্রিয়া কঠোরভাবে কার্যকর হয়। ঋণখেলাপিদের তালিকা প্রকাশ করে তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা এবং বিদেশে পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে হবে। তৃতীয়ত, বৈষম্য হ্রাসের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ ন্যায্য সুযোগ পায়। চতুর্থত, কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বাতিল করে দুর্নীতিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে কঠোরভাবে দমন করতে হবে। সর্বোপরি, নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে, যেন তারা দুর্নীতি ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর তুলতে পারে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নির্ভর করছে কেবল মেগা প্রকল্পের বাহ্যিক চাকচিক্যের ওপর নয়. বরং সুশাসন. জবাবদিহি ও ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক বণ্টনের ওপর। অন্যথায় উন্নয়নের এই প্রদর্শনী হবে ভঙ্গুর. আর জনগণের স্বপ্ন ভেঙে পড়বে অবিশ্বাস ও হতাশার ধ্বংসস্তূপে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই বিচারহীনতা ও রাজনৈতিক সহিংসতা রাষ্ট্র ও সমাজকে ক্ষতবিক্ষত করে এসেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার লড়াই এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যেখানে বিচারপ্রক্রিয়া প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়ে। প্রভাবশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও ব্যক্তিরা অপরাধ করেও শাস্তি এড়িয়ে যায়, আর সাধারণ মানুষ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। সত্তর ও আশির দশকে সামরিক শাসনের দীর্ঘ সময়ে ভিন্নমত দমন করা হয়েছিল ভয়াবহভাবে। বিরোধী নেতাকর্মীদের নির্বিচারে গ্রেফতার, নির্যাতন, গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড তখনকার রাজনৈতিক জীবনের বাস্তব চিত্র ছিল। প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যে জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষীণ হয়ে পড়ে। গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের পর নব্বইয়ের দশকে নতুন আশা জাগলেও রাজনৈতিক সহিংসতার ধারা থামেনি। প্রতিটি নির্বাচন ও বিরোধী আন্দোলনে সহিংসতা যেন নিয়মে পরিণত হয়। হরতাল, অবরোধ, ককটেল বিস্ফোরণ, অগ্নিসংযোগে শত শত সাধারণ মানুষ হতাহত হয়, হাজারো পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় [illegible] কিন্তু অধিকাংশ ঘটনায়

ক্ষমতার আশ্রয়ে শাস্তি পায় না, তখন সহিংসতা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এর ফলে রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের আস্থা ভেঙে যায়, আর গণতন্ত্র একটি প্রহসনে পরিণত হয়।

আজও জনগণের মনে প্রশ্ন রয়ে গেছে: এই রাষ্ট্র কি সত্যিই জনগণের জন্য, নাকি কেবল ক্ষমতাবানদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য? ইতিহাস প্রমাণ করেছে, বিচারহীনতার অবসান না হলে রাজনৈতিক সহিংসতা থামবে না কখনো, আর একটি টেকসই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে।

বাংলাদেশে না [illegible] সবসময়ই একটি স্পর্শকাতর ইস্যু। তবে ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনকাল এ দেশের নারীদের জন্য এক গভীর বেদনার অধ্যায় হয়ে উঠেছে। উন্নয়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ, মেট্রোরেল কিংবা পদ্মাসেতুর আলোয় ঢেকে গেছে এমন হাজারো নারীর আর্তনাদ, যাদের শরীরে ও আত্মায় বসে আছে অবমাননার নীল ছাপ। ইসলাম নারীদের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মহান আল্লাহ তাআলা নারীকে সন্মান, মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছেন। নবী করিম সা. বলেছেন, নারীর সম্মান রক্ষা করা পুরুষের দায়িত্ব, আর সৃষ্টির রংপুরের শান—নারী হিসাবে আল্লাহ তাআলা বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। ইসলামে নারীর জীবন, শিক্ষা, সম্পত্তি, নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষার ব্যাপারে স্পষ্ট বিধান রয়েছে। ইসলাম নারীর প্রতি সহিংসতা, অবমাননা, ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানিকে কঠোরভাবে নিন্দা করে এবং এসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করেছে। তবু, এই সময়ের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক সত্য হলো—ধর্ষণ যেন একটি স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৮–৯৯ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ কর্তৃক সংঘটিত ধর্ষণের শতকের ঘটনায় গোটা জাতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল, ছাত্রলীগ নেতা জাসিম উদ্দিন মানিক ও তার অনুসারীরা অন্তত ২০ জন ছাত্রীকে ধর্ষণ এবং শত শত নারী শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানি করে। আরও মর্মান্তিক হলো—“১০০তম ধর্ষণ” উপলক্ষে কেক কেটে উৎসব করার মতো ভয়াবহ অমানবিকতার নজির সৃষ্টি

দ্রুত ও নিরপেক্ষ বিচারের দাবি তোলে। এভাবে দুই যুগের ব্যবধানে একই শিক্ষাঙ্গনে একই দলের নাম জড়িয়ে ধর্ষণের পুনরাবৃত্তি প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশে ধর্ষণ আর বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়; এটি রাজনৈতিক সন্ত্রাসের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিহাস বারবার ফিরে এসেছে, বিচার বারবার অনুপস্থিত থেকেছে। শুধু ক্যাম্পাস নয়, বাংলাদেশের প্রতিটি ঘর, রাস্তা, পরিবহন—সবখানেই নারীরা একেকটি আতঙ্কের নাম। ২০২৪ সালের UNFPA ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর যৌথ জরিপে প্রকাশিত হয়েছে, দেশের ৭০ % নারী জীবদ্দশায় অন্তত একবার শারীরিক, মানসিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। অথচ এই তথ্যের বিপরীতে রাষ্ট্রীয় আইনি ও সামাজিক পদক্ষেপের পদক্ষেপের অভাব হতবাক করে। জনসাধারণের জায়গায় নারীরা কতটা অনিরাপদ তা প্রমাণ করে আরও একটি পরিসংখ্যান—৭৫.৯% নারী জানিয়েছেন, তাঁরা পাবলিক স্পেসে সহিংসতার শিকার হয়েছেন। অর্থাৎ নারীরা আজ শুধু নিজের ঘরেই নয়, রাস্তায়, যানবাহনে, শিক্ষাঙ্গনে, এমনকি রাজনৈতিক আন্দোলনেও নিরাপদ নন। বিশেষ করে ২০২৪ সালের রাজনৈতিক আন্দোলনে পুলিশের দ্বারা আন্দোলনরত নারীদের বিরুদ্ধে যেভাবে ধর্ষণের ভয় দেখানো হয়েছে, শ্লীলতাহানি করা হয়েছে, তাতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এবং যৌন নির্যাতন একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। বহু ছাত্রী ছাত্রলীগ কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছেন, হিজাব ও বোরখা পরতে বাধা দেওয়া হয়েছে,নামাজ পড়লে "জঙ্গি" তকমা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, ধর্মীয় পোশাক ও পরিচয় ধারণের কারণে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকাও ছাত্রীদের প্রকাশ্যে তুচ্ছ–তাচ্ছিল্য করেছেন এবং সামাজিকভাবে হেয় করেছেন। এটি নিছক ব্যক্তিগত অপমান নয়, বরং ধর্মীয় বৈষম্য ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন—যেখানে একজন নারী তার মৌলিক পোশাক-পরিচ্ছদ ও ধর্মীয় স্বাধীনতা থেকেও বঞ্চিত

আরও একা, ভীত এবং নিঃস্ব করে তুলেছে। এই ইতিহাস কোনো শ্লোগান নয় —এটি নির্মম সমাজ বাস্তবতা। উন্নয়নের আলোকোজ্জ্বল ভাষণের মাঝে যেসব নারী আজও বিচারহীনতা , অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার , তাদের চোখের জলই বলে দেয় —কোনটা সত্য , আর কোনটা প্রচার। শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশের নারীরা একদিকে উন্নয়ন আর নারী -ক্ষমতায়নের কথা শুনেছে , অন্যদিকে প্রতিনিয়ত সহিংসতা , ধর্ষণ , নির্যাতন ও হত্যার বিভীষিকাময় বাস্তবতার ভেতর দিয়ে গেছে। রাষ্ট্রপ্রধান একজন নারী হওয়া সত্ত্বেও এই সময়ে নারীর নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার যে চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে , তা ইতিহাসে গভীর বেদনার অধ্যায় হয়ে থাকবে। ইসলামিক শিক্ষায় নারীর সম্মান ও অধিকার স্পষ্ট নির্দেশিত। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন , নারীর জীবন ও সম্মান রক্ষা পুরুষদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। নবী করিম সা . বলেছেন , "যে ব্যক্তি নারীর প্রতি অবজ্ঞা দেখাবে , আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না।" ইসলাম নারীদের শিক্ষা , সম্পত্তি অর্জন , কর্মসংস্থান ও সামাজিক অংশগ্রহণের অধিকার দিয়েছেন , একই সঙ্গে সুরক্ষা ও সম্মান রক্ষায় কঠোর বিধান রেখেছেন। নারীর প্রতি সহিংসতা , ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানি ইসলামে নিষিদ্ধ ও অপরাধ। শেখ হাসিনার শাসনামলের ভয়াবহ চিত্রগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় , ধারাবাহিকতা। খুলনার স্কুলছাত্রী তৃষার আত্মহত্যা , নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে গৃহবধূকে বিবস্ত্র করে নির্যাতন , সাভারে ধর্ষণের পর হত্যাকাণ্ড , সুনামগঞ্জে শিক্ষার্থীদের গণধর্ষণ , সিলেটের এমসি কলেজে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ , কুমিল্লায় শিশুকে নির্যাতন —এসব কেবল কয়েকটি উদাহরণ। প্রকৃত চিত্র আরও ভয়াবহ , যা গণমাধ্যমে আসে না , পুলিশের রিপোর্টে থাকে না , কিংবা মামলা হওয়ার আগেই চাপা পড়ে যায়। সবচেয়ে দুঃখজনক হলো —অপরাধ ঘটার পরও প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অভিযোগ নেয় না , তদন্তে গড়িমসি করে , আলামত সংগ্রহে ব্যর্থ হয় , আর

থাকা সত্ত্বেও দেশের নারীরা ধর্ষণ, গুম, নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন এবং ন্যায়বিচার পাচ্ছেন না—এটি ভয়ানক বৈপরীত্য, যা প্রমাণ করে শাসকের অবস্থান শুধু ঘোষণায় সীমাবদ্ধ, বাস্তবে নয়। এই শাসনকাল নারীর আর্তনাদের শতক হিসেবেই ইতিহাসে লেখা থাকবে—যেখানে নারীরা শুধু রক্ত ঝরিয়েছে, আর রাষ্ট্র নীরবে দাঁড়িয়ে থেকেছে।

সুতরাং, শেখ হাসিনার শাসনামলে নারী নিরাপত্তার পরিস্থিতি কোনো উন্নয়ন নয়, বরং ভয়াবহ সামাজিক ব্যর্থতা ও মানবিক সংকট। এই সংকট আইন দিয়ে নয়—শাসনব্যবস্থার ন্যায়পরায়ণতা, প্রশাসনের জবাবদিহি ও জনগণের সংগঠিত প্রতিবাদ ছাড়া দূর করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্র যদি নারীর কান্না না শোনে, তবে সেই রাষ্ট্র নিজেই একদিন মানুষের ন্যায্যতা হারিয়ে ফেলবে।

প্রবাসী হলেন সেইসব মানুষ, যারা জীবিকার তাগিদে নিজ ভূমি ছেড়ে বিদেশের অচেনা আকাশের নিচে কষ্টের জীবন বেছে নিয়েছেন। দিনের পর দিন রোদে-ঘামে শ্রম দিয়ে রেমিট্যান্স পাঠান পরিবারে, দেশে, রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে। তাদের ঘামে চলে দেশের ব্যাংক, বাজেট, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। অথচ দেশের মাটিতে তারা যেন পরবাসী; স্যালুট নয়, জোটে সন্দেহের চোখ, তিরস্কারের ভাষা, আর অপমানের আচরণ। এই অবিচার সবচেয়ে নগ্নরূপে দেখা যায় দেশের বিমানবন্দরে, বিশেষ করে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। যেখানে প্রবাসীরা আনন্দ আর আশা নিয়ে পা রাখেন, সেখানে অপেক্ষা করে লাঞ্চনা ও লুটপাট। লাগেজ পেলে তা খোলা অবস্থায়, মূল্যবান জিনিসপত্র উধাও। ব্যাগ না পেলে বলা হয়—“ভুলে অন্য গন্তব্যে চলে গেছে”। সিসিটিভি ফুটেজ চাইলে উত্তর আসে—“কাজ করছে না”। এই চুরির ইতিহাস নতুন নয়। আশির দশক থেকেই লাগেজ থেকে জিনিস চুরি, প্রবাসীদের হয়রানি, কাস্টমসের ঘুষ দাবি সবই চলে আসছে প্রথার মতো। কেউ দামি মোবাইল আনলে সেটা “বাণিজ্যিক পণ্য” ঘোষণা দিয়ে আটকে রাখা হয়। কেউ স্ত্রী কিংবা সন্তানের জন্য উপহার আনলে তা বাজেয়াপ্ত করা হয়। বিনিময়ে দিতে হয় “ভিতরের” কোনো লোককে কিছু নগদ টাকা—তবেই মাল ফেরত। বিভিন্ন

প্রবাসীরা যখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিদেশে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করছেন, তখন দেশে ফিরে তারা নিজেদের অপমানিত দেখেন নিজেরেই মাটিতে। এই অভিজ্ঞতা শুধু একটি ব্যক্তিগত দুঃখ নয়—এটি রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর আস্থা হারানোর সূচক। যেই রাষ্ট্র তার অর্থনৈতিক বীরদের সম্মান দিতে জানে না, সে রাষ্ট্রের উন্নয়ন কেবলই বাহ্যিক পরিসংখ্যান, ভেতরে ফাঁপা। এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে শুধু প্রবাসীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না—ক্ষতিগ্রস্ত হবে রাষ্ট্র। কারণ প্রবাসীরা যখন আস্থা হারাবেন, তখন রেমিট্যান্স আসাও কমে যাবে। তারা অন্য উপায়ে অর্থ পাঠাবেন, কিংবা দেশে ফেরা নিয়েই ভাববেন না আর। এর চেয়ে ভয়াবহ-কী হতে পারে? যে দেশ তার সবচেয়ে পরিশ্রমী, সবচেয়ে ত্যাগী সন্তানদের সসম্মানে বরণ করতে পারে না, সে দেশের উন্নয়ন আর গর্ব, দুইই প্রশ্নবিদ্ধ। রাষ্ট্র যদি চায় প্রবাসীদের সত্যিকার অর্থে “জাতীয় গর্ব” হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে, তবে প্রথম পদক্ষেপ হতে হবে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা। এই ইতিহাস আমরা এখন লিখছি। কিন্তু আমাদের চুপ থাকা মানেই অপরাধীদের পক্ষ নেওয়া। আমাদের বিবেক যদি জাগে, আমাদের প্রশাসন যদি সৎ হয়, তাহলে এই লজ্জার অধ্যায় আর দীর্ঘায়িত হবে না। না হলে আগামী প্রজন্ম একদিন হয়তো বলবে—“একটা সময় ছিল, যখন দেশের গর্বের মানুষগুলো দেশে ফিরে নিজেদের অপমানিত মনে করত।

১৯৭১ সালের এক রক্তাক্ত ভোরে বাঙালি জাতি মুক্তির স্বপ্নে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। পেছনে পড়ে ছিল দুই শতাব্দীর শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের দীর্ঘ ইতিহাস। সেই ইতিহাসের অবসানে অর্জিত হয়েছিল একটি স্বাধীন ভূখণ্ড, একটি জাতীয় পতাকা, আর অজস্র মানুষের আত্মত্যাগ। কিন্তু স্বাধীনতার ৫৪ বছর পেরিয়ে এসেও প্রশ্ন থেকে যায়—এই পথচলার শেষে আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি? কেন এখনো উন্নত দেশের মর্যাদায় পৌঁছাতে পারিনি? একই সময়ে স্বাধীনতা পাওয়া সংযুক্ত আরব আমিরাত কিংবা সিঙ্গাপুর আজ উন্নয়নের বিশ্বরোল মডেল হয়ে উঠেছে। আমিরাত তাদের তেলসম্পদকে দূরদর্শী পরিকল্পনায় কাজে লাগিয়েছে, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। সিঙ্গাপুর, একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্র হয়েও, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কঠোর প্রশাসনিক নীতির মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য অর্জন করেছে। অথচ বাংলাদেশ—যেখানে ছিল বিপুল সম্ভাবনা ও সংগ্রামের চেতনা—সেই পথেই পিছিয়ে পড়েছে।

দুর্নীতি। এটি কখনো ঘুষের রূপে, কখনো দলীয় সুপারিশে, আবার কখনো ক্ষমতাধর চক্রের ছায়ায় সরকারি দপ্তর ও সেবাব্যবস্থাকে গ্রাস করে চলেছে। দক্ষতা নয়, পরিচয়ই হয়ে উঠেছে প্রাপ্তির মাপকাঠি। স্কুল-কলেজ, ভূমি অফিস, হাসপাতাল, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী—প্রায় সর্বত্রই অনিয়ম, পক্ষপাত ও স্বজনপ্রীতির ছাপ স্পষ্ট। এসব অন্যায় সমাজের ভিতরে পচন ধরিয়েছে, দুর্বল করে ফেলেছে জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড। আমরা আজ বড় গলায় বলি—পদ্মা সেতু হয়েছে, মেট্রোরেল চলছে, ফ্লাইওভার শহরকে বিভক্ত করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—এই উন্নয়ন কি সত্যিই সাধারণ মানুষের জীবনে ছোঁয়া দিয়েছে? উন্নয়ন হয়েছে, নিঃসন্দেহে, কিন্তু তার সুফল কাদের জন্য বরাদ্দ? একজন কৃষকের সন্তান এখনো হাসপাতালে বেড পায় না, একটি গ্রামীণ পরিবারের স্বপ্ন ডুবে যায় বন্যার জলে, মেধাবী ছাত্র পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ঝরে পড়ে। এই উন্নয়ন হয়ে দাঁড়িয়েছে আলোকসজ্জার মতো—দূর থেকে উজ্জ্বল, কিন্তু কাছ থেকে ফাঁপা। স্বাধীনতা-পরবর্তী রাজনীতির ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় এক বিষণ্ন চিত্রপট—ক্ষমতার মানে যেন বিরোধীকে নিশ্চিহ্ন করা, বাকস্বাধীনতার কণ্ঠরোধ, ও প্রশাসনের-দলীয়করণ। এই প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি শুধু অগ্রগতিকে রুদ্ধ করেনি, বরং জাতিকে বিভক্ত করেছে অবিশ্বাস আর ঘৃণার দেয়ালে। ইসলামী মূল্যবোধ অনুযায়ী, নেতৃত্ব একটি আমানত—ক্ষমতা মানে খেদমত, কর্তৃত্ব নয়। রাসূলুল্লাহ □ মদীনার রাষ্ট্রে ইনসাফ কায়েম করেছিলেন, প্রতিশোধ নয়। বর্তমান রাজনীতিকে এই নৈতিক নীতিতে ফিরিয়ে না আনলে উন্নয়ন শুধু অবকাঠামোর স্তরে আটকে থাকবে, চরিত্র গঠনের জায়গায় নয়। তবুও আমরা হাল ছাড়ি না। কারণ এই জাতির ভেতর এখনো প্রাণশক্তি আছে, আছে মেধাবী জনশক্তি, উদ্যমী উদ্যোক্তা, পরিশ্রমী প্রবাসী জনগোষ্ঠী। প্রয়োজন শুধু একটি স্বচ্ছ ও দায়িত্বশীল রাষ্ট্র পরিচালনা, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন এবং নৈতিক শিক্ষায় গড়া নতুন প্রজন্ম।

যুদ্ধের ইতিহাসে দেখা গেছে, বিজয় নির্ভর করে কেবল অস্ত্রের আধুনিকতা বা সংখ্যার ওপর নয়, বরং প্রস্তুতি, শৃঙ্খলা ও সততার ওপর। প্রাচীন রোমান সৈন্যরা যেমন ভঙ্গুর বর্মের কারণে পরাজিত হয়েছিল, তেমনি আধুনিক যুগেও সেই ইতিহাসের পাঠ প্রাসঙ্গিক। স্বাধীন বাংলাদেশ সামরিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন করেছে, তবে সেখানে দুর্নীতি ও ব্যবস্থাপনার ত্রুটি দেশের নিরাপত্তায় প্রভাব ফেলেছে। ২০২৫ সালের ২১ জুলাই দুপুর দেড়টার দিকে রাজধানীর উত্তরা এলাকায় ঘটে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা—বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি এফ-৭ বিজিআই যুদ্ধবিমান মাইলস্টোন কলেজের একটি দোতলা ভবনে বিধ্বস্ত হয়। ওই ভবনে তখন স্কুল শাখার ক্লাস চলছিল। দুর্ঘটনার ধোঁয়া ও ধ্বংসাবশেষ এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এই ঘটনা শুধু প্রাণহানির আশঙ্কাই বাড়ায়নি, দেশের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতাও প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর দুর্বলতার অন্যতম কারণ দুর্নীতি। সামরিক কেনাকাটায় ঘুষ, অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাৎ ক্ষমতাবানদের মধ্যে বিস্তৃত। ১৯৯৯ সালে মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান কেনাকাটায় কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছিল। সেনাবাহিনীতেও দুর্নীতির প্রবণতা বাড়ছে—গত ১৫ বছরে সেনাবাহিনীর কেনাকাটায় প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির মাধ্যমে লোপ পেয়েছে। সেনা কেনাকাটার সব নিয়ন্ত্রণ ছিল ক্ষমতাবান এক ব্যক্তি তারিক সিদ্দিকের হাতে, যিনি কমিশন হিসেবে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ঘুষ নিতেন। তার অনুমতি ছাড়া কোনো ক্রয় হয়নি। আরেকটি বড় বাধা হলো প্রতিবেশী ভারত। ভারতীয় সামরিক আধিপত্য এবং কূটনৈতিক চাপ বাংলাদেশকে স্বাধীনভাবে সামরিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন করতে বাধাগ্রস্ত করেছে। বিশেষ করে আধুনিক প্রযুক্তি ও অস্ত্রকেনার ক্ষেত্রে ভারতের সরাসরি বা পরোক্ষ বাধা লেগেথাকে, যা বাংলাদেশের আকাশ

ভারতের বাধা ও অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার ঘাটতির কারণে সামরিক সক্ষমতা চাহিদা অনুযায়ী শক্তিশালী হয়নি। দুর্নীতি ও অনিয়ম দেশের নিরাপত্তাকে দুর্বল করে , আর প্রতিবেশীদের সামরিক আধিপত্য আমাদের স্বাধীন পরিকল্পনায় বাধা দেয়।

সমস্যাগুলো মোকাবেলায় প্রথম ধাপ হল জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে দুর্নীতি দমন করা। সামরিক কেনাকাটায় কঠোর নজরদারি , আধুনিক প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তির উন্নয়ন জরুরি। পাশাপাশি প্রতিবেশীদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করাও প্রয়োজন ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো দেশের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও সততা ফিরিয়ে আনা । একত্রিত প্রচেষ্টায় দূর্নীতি ও অনিয়ম দূর করে সঠিক পরিকল্পনা ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার আকাশ নিরাপদ রাখতে পারবে এবং শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে চলমান উন্নয়নের যাত্রা ছিল চ্যালেঞ্জপূর্ণ ও নানা প্রতিবন্ধকতায় আবর্তিত। দেশ অভিভূত হয়েছে নানা সংকটে, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক দুর্বলতা, সামাজিক বৈষম্য ও সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তিতে। জাতি হিসেবে আমরা স্বপ্ন দেখেছি আধুনিক , সমৃদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার , কিন্তু ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতার কারণে সেই স্বপ্ন আজো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। এই প্রবন্ধে আমি বাংলাদেশের উন্নয়ন আখ্যানের ইতিহাস পর্যালোচনা করে বিশ্লেষণ করব কেন আমরা এখনও কাঙ্খিত উচ্চতায় পৌঁছতে পারিনি , এবং কোন পথে উত্তরণের আশা রাখা উচিত।

আমাদের উন্নয়নের বাঁধাগুলো : বাংলাদেশের উন্নয়নের গতিপথ বিশ্লেষণে আমরা প্রথমেই বুঝতে পারি —একটি জাতির ভাগ্য ও ভবিষ্যত কতটা তার ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত। আমাদের দেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন , পাকিস্তান যুগের শোষণ , স্বাধীনতা যুদ্ধ , ও স্বাধীনতার পর রাজনৈতিক অস্থিরতা —এইসব ধারাবাহিক ঘটনাক্রম আমাদের আজকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা নির্মাণ করেছে।

ব্রিটিশ শাসনের অবদান ও সীমাবদ্ধতা :ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বাংলায় আধুনিক শিক্ষা , আইন-কানুন ও রেলপথের মতো অবকাঠামো নিয়ে এসেছিল

যা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ফেটে ওঠে। এই সময়ের অনিয়ম , দুর্নীতি ও সামরিক শাসনের ছায়া স্বাধীনতার পরও দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনে ব্যাপকভাবে প্রবেশ করে।

স্বাধীনতার পর : উন্নয়নের স্বপ্ন ও বাস্তবতার লড়াই : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয় , এবং জাতি হিসেবে আমাদের সবচেয়ে বড় আশা ছিল দ্রুত উন্নত দেশে পরিণত হওয়া। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে শান্তি , গণতন্ত্র , সমতা ও উন্নয়নের অঙ্গীকার করা হয়। কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। রাজনৈতিক অস্থিরতা : স্বাধীনতার পরপরই রাজনৈতিক হত্যা , বিপ্লব ও সামরিক অভ্যুত্থান দেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করে।

দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি : প্রশাসনে দুর্নীতি একরকম নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায় , যা জনগণের আস্থা ক্ষুণ্ন করে।

দীর্ঘকালীন সামরিক শাসন : গণতন্ত্রের বিকাশ থমকে যায় সামরিক শাসনের কারণে। শিক্ষা ও প্রযুক্তির অবহেলা: আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার বিকাশ প্রাথমিক পর্যায়েই রুদ্ধ হয়ে যায়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভাজন : ধর্মীয় ও সামাজিক দলীয় বিভাজন জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধ কমিয়ে দেয়।

এসব কারণে দেশের উন্নয়নের রূপরেখা বারবার পিছিয়ে যায় , এবং আমাদের অর্থনীতি ও সমাজের উন্নতি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকে।

উন্নয়নের বাধা : ইতিহাসের নিরবধি প্রতিবন্ধকতা -

১.রাজনৈতিক ব্যাধি : বিভাজন ও প্রতিহিংসার রাজনীতি বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলো প্রায়শই ক্ষমতা দখলের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে , যা নীতিগত আলোচনার পরিবর্তে ব্যক্তিগত ও দলীয় প্রতিহিংসায় রূপ নেয়। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা স্থগিত থাকে এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা দুর্বল হয়।

২.দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি

দুর্নীতি শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি করে না , বরং দেশের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও নৈতিকতাকে বিষন্ন করে।

৫. অবকাঠামো ও প্রযুক্তির অভাব
স্বাস্থ্যসেবা, যোগাযোগ, শক্তি সরবরাহসহ অবকাঠামোগত দিক থেকে দেশের প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কার্যক্রম যথাযথ মাত্রায় নেই। প্রযুক্তির ব্যবহার ও আধুনিকীকরণে বিলম্বের ফলে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় দেশের অবস্থান দুর্বল।

উত্তরণের সম্ভাব্য পথ: ইতিহাস থেকে শিক্ষা: যদিও বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে অনেক বাধা আছে, তবে ইতিহাস থেকে আমরা শিখতে পারি —সঠিক নীতি, রাজনৈতিক ঐক্য ও সামাজিক ঐক্যের মাধ্যমে উন্নয়নের স্বপ্ন পূরণ সম্ভব।

১. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি উন্নয়ন
একটি সুস্থ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেখানে বিরোধী দলের প্রতি শ্রদ্ধা ও সংলাপের মাধ্যমে দেশ এগিয়ে যাবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে দায়িত্বশীল ও জনকল্যাণমুখী হতে হবে।

২. দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ
দুর্নীতি নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত উন্নয়ন থেমে থাকবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে হবে।

৩. শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়ন
সকল শিক্ষাবিভাগে আধুনিক প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও মানবিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন করতে হবে। কওমি ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. সামাজিক ঐক্য ও মানবাধিকার
ধর্মীয় ও সামাজিক বিভাজন কাটিয়ে নাগরিক হিসেবে সকলের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়াদের সুযোগ সৃষ্টিতে মনোযোগ দিতে হবে।

৫. দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

রাখতে হবে, কঠিন পরিশ্রম ও দেশপ্রেমের হাত ধরে একদিন অবশ্যই অর্জিত হবে সেই উন্নত, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ।

শেষ কথা

বাংলাদেশ—এই নামটি কেবল মানচিত্রে আঁকা একটি দেশ নয়; এটি বাঙালির রক্ত, আত্মত্যাগ এবং এক অনবদ্য সাহসিকতার ফল। একদিন আমাদের পূর্বপুরুষেরা যুদ্ধ করেছিলেন একটি শোষণহীন, মর্যাদাবান রাষ্ট্রের জন্য। কিন্তু আজ, ৫০ বছরেরও বেশি সময় পরে, আমরা এক গভীর প্রশ্নের মুখোমুখি—আমাদের শত্রু কারা?

স্বাধীনতার মুহূর্তে বাংলাদেশ যে রাষ্ট্রটিকে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভেবে বুক পেতে দিয়েছিল, সেই ভারতই আজ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কৌশলগত ও আদর্শিক শত্রু। ইতিহাস, পরিসংখ্যান, এবং বাস্তবতা—সবকিছুই এই নির্মম সত্যকে বারবার প্রমাণ করেছে।

স্বাধীনতার পর থেকেই ভারত তার সাম্রাজ্যবাদী মুদ্রা প্রকাশ করেছে—সীমান্ত হত্যা, পানি ভাগাভাগির বৈষম্য, অর্থনৈতিক শোষণ, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তারা ক্রমাগত বাংলাদেশকে দুর্বল করে রেখেছে। বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা RAW-এর অনুপ্রবেশ এখন আর গুজব নয়, বরং স্বীকৃত বাস্তবতা। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণধর্মী পত্রিকা The Diplomat ও Al Jazeera তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে, কিভাবে RAW বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়া, মিডিয়া, এমনকি ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। ভারত শুধু রাজনীতি নয়, সমাজকেও টার্গেট করেছে। “লাভ জিহাদ” ও নারী পাচারের মাধ্যমে তারা মুসলিম তরুণ-তরুণীদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। প্রতিবছর সীমান্ত অঞ্চল থেকে শত শত মেয়ে নিখোঁজ

করে, “সংখ্যালঘু নির্যাতন” নাম দিয়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে উঠে পড়ে লাগে। বাস্তবে, আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ গণঅধিকার রক্ষার সংগ্রাম, কিন্তু ভারত সেটিকে কূটনৈতিকভাবে হত্যার ষড়যন্ত্রে নামে। আজ আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করার সময় এসেছে—আর কতকাল আমরা ভারতের এই মধ্যযুগীয় ষড়যন্ত্র আর প্রতারণামূলক বন্ধুত্বের মুখোশ সহ্য করবো? আমাদের স্বাধীনতা কি শুধু পাকিস্তানের শৃঙ্খল ছিন্ন করতেই ছিল, না কি ভারতের আধিপত্য থেকে মুক্ত হতে হবে আমাদের নতুন প্রজন্মকে?

ভারত আমাদের বন্ধু নয়। ভারত আমাদের শত্রু—এটি আজ ইতিহাস, তথ্য এবং অভিজ্ঞতার আলোকে স্পষ্ট সত্য। এখনই সময় নিজেদের ভিতর থেকে দালালদের চিহ্নিত করা, ভারতীয় প্রভাব প্রতিহত করা এবং সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে এক বিন্দুও আপোস না করার শপথ নেওয়ার। কোনো বিদেশি শক্তির দয়ার ওপর নয়, আমাদের মুক্তির পথ রচিত হবে জনগণের ঐক্য, ইমান, সচেতনতা এবং সাহসের ভিতর দিয়ে। এই বই কোনো রাজনৈতিক দলের প্রচারপত্র নয়, নয় কোনো মতাদর্শের ধ্বজা বহনকারী পুস্তিকা। এটি ইতিহাসের পাতায় চাপা পড়ে যাওয়া আর্তনাদের শব্দ, যেগুলো শাসকের বন্দুকের নল কিংবা মিডিয়ার মুখোশে হারিয়ে গেছে। আমি জানি, এই বইয়ের কারণে আমাকে অনেক কিছু সহ্য করতে হতে পারে—কিন্তু তবুও লিখেছি, কারণ সত্য বলা অপরাধ হলেও, চুপ থাকা আরও বড় অপরাধ।

আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই, দালালমুক্ত বাংলাদেশ গড়ি, আর দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করি—

বাংলাদেশ কারো করুণা নয়, এটি আমাদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত দেশ। এর স্বাধীনতা, মর্যাদা ও ভবিষ্যৎ রক্ষার দায়িত্ব আমাদের প্রতিটি নাগরিকের।

> সত্য উচ্চারণই প্রথম বিপ্লব।

আসুন, আমরা সবাই সেই বিপ্লবের পথে হাঁটি—কলম